সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

مجلّة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ২২ এপ্রিল ২০২৪ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ২৯-৩০

www.weeklyarafat.com

সুলতান হাসান আল বালখিয়া মসজিদ, ফিলিপাইন

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ২৯-৩০
✱ বার : সোমবার

◈ ২২ এপ্রিল-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৯ বৈশাখ- ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১২ শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক

মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক

মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক

রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

✍ **সম্পাদকীয়** ০৩

✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**

❖ **হাজ্জের মওসুম শুরু**

শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪

✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**

❖ **শাওয়াল মাসে নফল রোযার গুরুত্ব**

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৬

✍ **প্রবন্ধ :**

❖ **বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তবায়ন সময়ের দাবি**

প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১০

❖ **ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : শরয়ী ফায়সালা**

ভষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১১

❖ **কখন ফিলিস্তিন আমাদের নিকট ফিরে আসবে**

মূল : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ রসলান

অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ও আব্দুল্লাহ- ১৬

✍ **আলোকিত জীবন :**

❖ **... ইমাম ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ আদ্ দারেমী (রাহিমাহুল্লা-হ)**

লেখক : হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রাহিমাহুল্লা-হ)

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আসারি- ১৯

✍ **সমাজচিন্তা :**

❖ **ঈদ-উল-ফিতরের আমেজ : বহমান থাকুক ঘরে ঘরে**

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২২

✍ **ক্বাসাসুল কুরআন :**

❖ **যে নারীর আর্তনাদে ওহী নাযিল হয়**

আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫

✍ **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৬

✍ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**

❖ **শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা**

সাইফুল্লাহ ত্রিশালী- ২৯

✍ **মহিলা জগত :**

❖ **... রমনীদের আদর্শের প্রতীক “ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)”**

অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩৩

✍ **নিভৃত ভাবনা :**

❖ **ফুরালো তাক্বওয়ার মাস : কী পেলাম আমরা**

মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ৩৬

✍ **কবিতা** ৩৭

✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৮

☐ **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪১

✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩

☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঈদের আমেজে যেন কল্যাণের পথ হতে বিচ্যুত না হই!

আলহামদুলিল্লাহ! এবারের ঈদুল ফিত্র অত্যন্ত সুন্দর ও ভাব গম্ভীর্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো। ইসলামের ঈদ উৎসব সামাজিক ও জাতীয় ‘ইবাদত অনুষ্ঠানের নাম। শুরু হয় যাকাতুল ফিত্র আদায়, তাকবীর-তাহলীল ও সালাতের মাধ্যমে। সেখানে ঘটে মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের মিলন মেলা। নারীরা ইসলামী পর্দা মেনে এ মহা উৎসবে অংশ নেন। সালাতের পর ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ নসিহত পেশ করেন এবং দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মা’হর কল্যাণ কামনায় মাসনুন দু‘আ পাঠ করেন। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় অনুষ্ঠানিকতা। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময়। এ সময় পরস্পর বিনম্রচিত্তে বলে ওঠেন “তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম”-এর ভাবার্থ হলো– আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ও আপনাদের সালেহ তথা গ্রহণযোগ্য ‘আমল কবুল করুন –আমীন।

আহ্! এ বাক্যের মাঝে পূর্ণ প্রাপ্তির দৃঢ় প্রত্যাশা, দয়াময় মহান আল্লাহর প্রতি কঠিন আস্থা ও মুসলিম ব্যক্তিত্বের প্রতি সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে। মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। একে অন্যের কল্যাণ কামনা আদর্শিক, স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। যে মুসলিম প্রতিবেশীর কল্যাণ চায় না; বরং অনিষ্ট সাধনে সক্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর ভাষায় সে ঈমানদার নয়। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে নিজের জন্য যা ভালোবাসবে, অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসতে হবে। তাই একজন মুসলিম পুরো রমাযান মাস সিয়াম, ক্বিয়াম বা তারাবিহ্, কুরআন তিলাওয়াত, দু‘আ-ইস্তেগফার এবং হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রজনী ‘লাইলাতুল ক্বদ্‌র’ প্রাপ্তির একান্ত বাসনায় শেষ দশকে ই‘তিকাফ ও ‘ইবাদতের কঠোর সাধনার পর নিজের মাগফিরাত, নাজাত ও রহমতের এলাহী লাভের ব্যাকুলতায় যখন উদগ্রীব তখন মুসলিম ভাই-বোনকে ভুলে না; বরং দরদি মন নিয়ে বলে ওঠে– হে আল্লাহ! আপনি আমার ও মুসলিম ভাইয়ের সৎ ‘আমলগুলো কবুল করুন –আমীন। কী আকুতি, কী সহমর্মিতা ও মহান রবের সমীপে কী আত্মনিবেদন!

রমাযানের ফর্‌য সিয়াম শেষ হলো। যেকোনো ফর্‌য ‘ইবাদত করতে একজন মুসলিম বাধ্য, কিন্তু দেখার বিষয় হলো ফর্‌য আদায়ের পাশাপাশি একজন মুসলিম কতটুকু নফল ‘ইবাদত করছে। বান্দা ও তার রবের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ব্যতীত নফল তথা অতিরিক্ত ‘ইবাদত আদায় সম্ভব নয়। তাইতো প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আমার যত নিকটবর্তী হয়, ফর্‌য ‘ইবাদত দিয়ে তা হয় না।” বান্দা যখন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে তখন সে পূর্ণ আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়। তার চোখ, হাত-পা তথা কোনো অঙ্গই কোনোভাবে মহান আল্লাহর নাফরমানি করতে পারে না; বরং মহান আল্লাহর ইশারায় পুণ্যময় কাজে এ ইন্দ্রিয়গুলো সদা নিয়োজিত থাকে।

রমাযানের পর সিয়ামের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত চলমান রাখার লক্ষ্যে শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল সিয়াম পালনের প্রতি রাসূল (ﷺ) উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, “যে রমাযানের সিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করে, সে যেন পুরো বছরই সিয়াম পালন করল।” আল-কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে– যে কোনো ব্যক্তি একটি পুণ্যময় কাজ করলো তার জন্য রয়েছে দশগুনণ নেকি। অর্থাৎ- একমাস সিয়াম সমান ১০ মাস এবং ছয়টি নফল সিয়াম সমান ৬০ দিন তথা ২ মাস। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয় ‘ইবাদতগুজার বান্দাকে এক বছরের সওয়াব দিয়ে ধন্য করেন।

ইসলামই একমাত্র দীন যার প্রতিটি কর্মে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। একদিকে বান্দা মহান আল্লাহর ‘ইবাদতের মাধ্যমে আত্মপ্রশান্তি পায়। অপরদিকে চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় করার অনুপ্রেরণা পেয়ে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের অগ্রসৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাইতো বলি ইসলামের ঈদ নিছক উৎসব নয়; বরং ‘ইবাদত। আর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কেবল তাঁর ‘ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। একজন মুসলিম যখন তার পুরো জীবন মহান আল্লাহর বিধান মতো পরিচালনা করেন, তখন তার চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা, নিদ্রাযাপন ও বৈধ বিনোদন সবই ‘ইবাদতে পরিণত হয়। রুজি-রোযগার ও পরিবারকে হালাল উপার্জন খাওয়ালে তা বড়ো ‘ইবাদত বলে গণ্য হয়। আর সৎ উপার্জনকারী হয়ে যান মহান আল্লাহর বন্ধু। কিন্তু আমরা যদি এ পুণ্যময় জীবন যাত্রায় ন্যায়-অন্যায়কে একীভূত করে ফেলি, তখনই জীবনে নেমে আসে অমানিশা। তাই আসুন! আমরা আমাদের জীবনকে মহান আল্লাহর পথে পরিচালিত করি। তাহলে দুনিয়া হবে সুশৃঙ্খল ও আখিরাত হবে শংকামুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে প্রকৃত বান্দা হিসেবে কবুল করুন –আমীন। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

হাজ্জের মওসুম শুরু

–শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন★

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

“হাজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হাজ্জ-এর দৃঢ় সংকল্প করবে, তাঁর পক্ষে এ সময়ে স্ত্রী সহবাস, শরীয়ত গর্হিত কাজ এবং বিবাদ-বিসম্বাদ করা জায়িয নয়। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ করো, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। আর হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।”[১]

বিষয়বস্তু

উক্ত আয়াতে কারিমায় হাজ্জের নির্ধারিত সময় বলে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ‘উমরাহ্’র মাসআলাটি পৃথক করা হয়েছে। কেননা তা বছরের যে কোনো সময় আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে হাজ্জ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় সিদ্ধ নয়। তাছাড়া এ আয়াতে হাজ্জকালীন নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে সতর্ক করা হয়েছে।[২] মহান আল্লাহর বাণী :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ﴾

সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, হাজ্জের মাস হলো– শাওয়াল, যুলক্বাদাহ ও যুলহাজ্জ-এর প্রথম দশ (১০) দিন।[৩] ইমাম ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লা-হ) উক্ত বর্ণনার ধারাবাহিক সূত্র উল্লেখ করে একই সময়সীমার কথা জানিয়েন।[৪]

তাছাড়া আইয়্যামে তাশরীক-এর দিনগুলোও হাজ্জের দিনসমূহের মধ্যে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ...﴾

আয়াতখানা উক্ত অভিমতের যৌক্তিকতা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে। মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ﴾

আয়াতাংশের মূল উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যিনি হজ্জের শর্তপূরণ সাপেক্ষে হজ্জ সফরের ইহরাম বাঁধবেন এবং শর‘ঈ বিধি মতে এটার কার্যাদি চালিয়ে যাবেন। ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর ভাষ্যমতে এটিই হচ্ছে সর্ববাদি সম্মত উদ্দেশ্য। কাজেই যে ব্যক্তি হজ্জে গমন করবেন, তিনি হজ্জ সফরকালে বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ ক্রিয়া-কর্ম হতে মুক্ত-পবিত্র থাকবেন, তবেই তিনি মাবরূর হাজী বলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবেন।

الرفث কী?

সাধারণত الرفث দ্বারা শর‘ঈয়ত গর্হিত কাজকে বুঝায়। এখানে হাজ্জ ও ‘উমরাহ্-এর ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা‘আলা–

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

আয়াতাংশে الرَّفَثُ দ্বারা স্ত্রী সহবাসই উদ্দেশ্য করেছেন।[৫]

অনুরূপভাবে জৈবিক চাহিদা সমেত চুম্বন, স্পর্শ করণ কিংবা আলাপচারিতা সবই ইহরাম অবস্থায় الرَّفَثُ বা গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

★সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[১] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭।

[২] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- অনুদিত– মাওলানা মহিউদ্দিন খান, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদীনা- ১০২।

[৩] ফাতহুল বারী- ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ৯/১২১।

[৪] তাফসীর আত্ তাবারনী- ইমাম ইবনু জারীর, ৪/১১৬।

[৫] তাফসীর আত্ তাবারনী- ইমাম ইবনু জারীর, ৪/১২৬।

الفسق কী?

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) الفسق দ্বারা নাফারমানীমূলক কাজ বুঝিয়েছেন। আর ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হারাম-এর সীমানায় মহান আল্লাহর নাফরমানী করাকে উদ্দেশ্য করেছেন।[৬]

অন্যান্য আলেমগণের মতে এখানে الفسق দ্বারা গালমন্দ করা। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী–

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

হাদীসখানাকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মতে এখানে সকল প্রকার নাফরমানী উদ্দেশ্য।

আর فُسُوْقٌ দ্বারা ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। এমনকি ঝগড়ার জন্য অপরকে উত্যক্ত করাও এটার অন্তর্ভুক্ত, যা হাজ্জ অবস্থায় নিষিদ্ধ।

পরকালের পাথেয়

আল্লাহ তা‘আলা হাজীগণকে সকল প্রকার পাপ মুক্ত হয়ে নিবিষ্টমনে ভালো কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর তিনি একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি সর্ববিষয়ে অবগত আছেন। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন :

«مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

“যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করবে এবং স্ত্রী সহবাস করবে না এমনকি কোনো নাফরমানীমূলক কাজ করবে না, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত-পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসবে ঐ দিনের ন্যায়, যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।”[৭]

আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে পাপমুক্ত হজ্জ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী তারই প্রতিধ্বনি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।

অতএব, হে হাজী! এটি তাক্বওয়া অনুশীলনের সফর। পরকালের উত্তম পাথেয় সঞ্চয়ের সফর। পাপ মুক্তির সনদ লাভের সফর। কাজেই নিষ্ঠাবান মুত্তাকী হোন! এটাই প্রত্যাশা।

দারস-এর শিক্ষাসমূহ

১. হজ্জ নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হয়, পক্ষান্তরে ‘উমরাহ্ বছরের যে কোনো সময় আদায় করা যায়।

২. হাজ্জ সফরে নেকির পাশাপাশি সকল প্রকার গর্হিত কাজ পরিত্যাগে সংকল্পবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

৩. নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কোনো ‘ইবাদত মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

৪. কোনো ভালো কাজ করলে দম্ভ করা উচিত নয়, কেননা তা কেবল মহান আল্লাহর তাওফীক্ব-এ সম্ভব হয়েছে।

৫. পরকালের একমাত্র পাথেয় তাক্বওয়া। আর তাক্বওয়াশীলরাই বুদ্ধিমান।

উপসংহারে বলা যায় যে, হজ্জে বায়তুল্লাহ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। হজ্জ সফরে অবশ্যই মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। সর্বদা মহান আল্লাহকে সমীহ করে চলতে হবে। কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া অর্জন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ❑

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)’র উপদেশ

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বিখ্যাত তাবি‘য়ি ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আহনাফ ইবনু কায়স (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে এই দামি কথাগুলো বলেছিলেন :

১. যে খুব বেশি হাসাহাসি করে, তার মর্যাদা কমে যায়।

২. যে অধিক ঠাট্টা-মশকরা করে, তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য লোপ পায়।

৩. যার মধ্যে কোনো একটি বিষয় বেশি দেখা যায়, সেটাকে ঘিরেই সমাজে তার পরিচিতি ছড়ায়।

৪. যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে।

৫. যে বেশি বেশি ভুল করে, তার লজ্জা কমে যায়।

৬. যার লজ্জা কমে যায়, তার ভেতর মহান আল্লাহর ভয় কমে যায়।

৭. যার আল্লাহভীতি কমে যায়, তার অন্তর মরে যায়।

(ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফ্ওয়াহ- ১/১৪৪৯)

আসুন! মহান আল্লাহকে ভয় করি, মৃত্যুকে স্মরণ রেখে পথ চলি, সুন্নতি জীবন গড়ি।

---

[৬] *আল মিসবাহুল মুনীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ১৯৭।*

[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২১; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৩।*

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

শাওয়াল মাসে নফল রোযার গুরুত্ব

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ (رضي الله عنه) أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

সরল অনুবাদ

“আবূ আইয়ূ্যব আল আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন– রমাযান মাসের রোযা পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা পালন করা সারা বছর রোযা রাখার মতো।”[৮]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

নাম : খালিদ। **উপনাম :** আবূ আইয়্যুব। উপনামেই তিনি বেশি পরিচিত। **পিতার নাম :** যায়েদ ইবনু কালিব। বানী নাজ্জারের সন্তান। মদীনার অধিবাসী। মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদরী সাহাবী।

বংশ পরম্পরা : আবূ আইয়্যুব খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনে কুলাইব সা’লাবা ইবনুল আবদে আউফ ইবনে গানাম, আল-আনসারী, আন-নাজ্জারী আল্ খাযরাজী।

জন্ম : হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে মদীনায় খাযরাজ বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : ৬২১ খ্রি. প্রথম আকাবার কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ﷺ) হিজরত করে মদীনায় গেলে তাঁর গৃহে অবস্থান করেন।

জিহাদে যোগদান : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন। খিলাফতের দীর্ঘ ৩০ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য হিজরির ২১ সালে মিসর অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সরকারী দায়িত্ব পালন : ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ৩৮ হিজরিতে খারেজী বিদ্রোহ দমনে নাহরাওয়ান অভিযানে তিনি ‘আলীর সাথে ছিলেন। সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন কি-না এর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ বলেছেন ২১০টি। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে ১৫৫টি। কারো মতে ১৫০টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাক ‘আলাইহ হাদীস হলো ১৩টি, অন্যমতে ৭টি।

মৃত্যু : কনস্টান্টিনোপল অভিযানে থাকাবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল (ﷺ) যখন এ স্থানটি বিজয়ের সুসংবাদ দেন তখন থেকেই তাঁর কনস্টান্টিনোপল অভিযানে যাওয়ার বাসনা জাগে। অশীতিপরবৃদ্ধ বয়সে সৈন্যদের সাথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি অসিয়ত করেন আমি যদি মারা যাই তবে তোমরা আমাকে বহন করে নিয়ে আসবে আর যদি তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় থাকো তবে তোমাদের পায়ের নীচেই আমাকে দাফন করিও। আল্লাহ তাঁর অন্তীম বাসনা পূর্ণ করলেন। তিনি ৫১ মতান্তরে ৫২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

শাওয়াল আরবী মাসগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের বহুবিধ তাৎপর্য রয়েছে। আরবি চান্দ্রবর্ষের দশম মাস শাওয়াল। এটি হজের তিন মাসের (শাওয়াল, যিলক্বদ, যিলহজ্জ) অগ্রণী। এ মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিত্‌র উদযাপিত হয়। পহেলা শাওয়াল সাদাক্বাতুল ফিত্‌র বা ফিত্‌রা আদায় করা এবং ঈদের সালাত পড়া ওয়াজিব। এই মাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে হজের, এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে ঈদের; এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে রোযা ও রমাযানের এবং এর সঙ্গে যোগ রয়েছে সাদাক্বাহ্ ও যাকাতের। এ মাসের ৭ তারিখে তৃতীয় হিজরি সনে (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে) ওহুদ যুদ্ধে বিজয় হয়েছিল। এই মাস ‘আমল ও

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৮।*

‘ইবাদতের জন্য অত্যন্ত উর্বর ও উপযোগী। রমাযানের রোযার পরে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার তাৎপর্য অনেক বেশি। রাসূল (ﷺ) তার উম্মাতের জন্য প্রতি মাসেই রোযার ব্যবস্থা রেখেছেন। কেননা রোযার সমপর্যায়ে কোনো ‘ইবাদত নেই। আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন :

قَلَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بعمل، قَالَ : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنهُ لَا عِدْلَ لَهُ". قَلَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بعمل، قال : "عَلَيْكَ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ" قَلَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بعمل؟ قال : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ".

(আবূ উমামাহ্ বাহেলী বলেন,) আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন : তুমি রোযা রাখো। নিশ্চয়ই রোযার সমতুল্য কোনো ‘ইবাদত নেই। আমি আবার বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা পালন করো। রোযার সমপর্যায়ের কোনো ‘ইবাদত নেই। আমি আবারও বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা পালন করো। রোযার মতো কোনো ‘ইবাদত নেই।[৯]

আলোচ্য হাদীসে সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে মূল্যবান এবং ফযীলতপূর্ণ ‘আমলের শিক্ষা চেয়েছিলেন। নেক ‘আমল ছিল সাহাবীগণের আগ্রহের চরম লক্ষ্যবস্তু, এই হাদীস থেকে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কথার জবাবে বললেন–

"عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنهُ لَا عِدْلَ لَهُ".

তুমি সিয়াম পালন করো, নিশ্চয়ই সিয়ামের তুলনীয় কোনো ‘ইবাদত নেই।

রোযা আল্লাহ তা‘আলার নিকট পছন্দনীয় ‘ইবাদত। আত্মার পরিশুদ্ধি, তাক্বওয়া অর্জন, মহান আল্লাহর সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক স্থাপন, মানবিকতার বিকাশ, নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ে রোযার মতো তুলনাবিহীন ‘ইবাদত আর নেই। হাদীসে রোযাকে তুলনাহীন ‘ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রোযার কল্যাণধারা শুধু রমাযান মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ কল্যাণধারা আল্লাহর বান্দাগণ বছরব্যাপী জারি রাখতে পারেন। মহান আল্লাহর পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি রোযা বান্দাহর জন্য অনেক বেশি উপকারী ও প্রাপ্তির।

নফল রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত : নফল ‘ইবাদতের মধ্যে নফল রোযা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল রোযা রাখা যায়। একেক নফল রোযার একেক ফযীলত। নিম্নে নফল রোযা সম্পর্কে বিস্তারীত আলোচনা করা হলো।

নফল রোযার ফযীলত সম্পর্কে আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضي الله عنه)، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ : «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

যে লোক একদিন মহান আল্লাহর পথে রোযা পালন করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার মুখমণ্ডল জাহান্নাম হতে ৭০ বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন।”[১০]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ».

যে লোক একদিন মহান আল্লাহর পথে রোযা পালন করবে, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে তার থেকে ১০০ বছর দূরে রাখবেন।[১১] অন্য বর্ণনায় আছে– তার এবং জাহান্নামের মাঝে দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের সমান অর্থাৎ- ৫০০ বছরের দূরত্ব।[১২]

তবে রোযার মহৎ শিক্ষাটা যেন শুধু রমাযানের একটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বছর ভরে জীবনজুড়ে এর অনুশীলন হতে থাকে সেজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বছরের বার মাসের বিভিন্ন সময়ে নফল রোযা নিজে

---

[৯] *সুনান আন্ নাসায়ী- ৪/১৬৫, হা. ২২২০; সহীহুত্ তারগিব- ১/২৩৮, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, ১/২৬৮, হা. ৫১৯।*

[১০] *বুখারী- হা. ২৮৪০; মুসলিম- ১১৫৩; মিশকাত- হা. ২০৫৩।*

[১১] *আন্ নাসায়ী; সুনানে কুবরা- ২৫৭৪; সহীহাহ্- হা. ২২৬৭।*

[১২] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ২২৬৮।*

রেখেছেন এবং উম্মতকে রাখতে উৎসাহিত করেছেন। নফল রোযাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা।

শাওয়াল মাসের রোযা : রমাযান মাসে এক মাস রোযা রাখার দ্বারা বান্দা মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। নফল সালাত, রোযার দ্বারাও বান্দা মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। এ জন্যে রমাযানের রোযার পর শাওয়ালের রোযা রাখা একান্ত প্রয়োজন। রমাযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ৬ রোযা রাখার দ্বারা পুরো বছর রোযা রাখার সাওয়াব অর্জিত হয়। শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম নাসায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,

«اَللّٰهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».

“আল্লাহ তা‘আলা একটি নেকিকে দশটি নেকির সমান করেছেন। অতএব একমাস দশ মাসের সমান এবং ফিত্‌রের পর ছয় দিন (৬ × ১০ = ৬০ দিন অর্থাৎ- দুই মাস) পূর্ণ বছর।”[১৩]

একই হাদীস ইবনু খুযাইমাহ্‌ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذٰلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

“রমাযানের রোযা দশ মাসের সমান এবং শাওয়ালের ছয় দিনের রোযা দুই মাসের সমান, এটাই পূর্ণ বছরের রোযা।”[১৪]

হাফিয ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : শাওয়াল ও শা’বান মাসের রোযা ফর্‌য সালাতের পূর্বে ও পরে সুন্নাত সালাত আদায়ের ন্যায়। ফর্‌য সালাতে যেমন কোনো ভুল বা কমতি থাকলে তা সুন্নাত ও নফল সালাত পূর্ণ করে দেয়, তেমনি শাওয়াল ও শা’বানের রোযা ফর্‌য। রোযা ভুল বা কমতি পূর্ণ করে দেয়। সুতরাং রমাযানের রোযার পর শাওয়ালের রোযা পালন করা উচিত।

হাম্বলি মাযহাব ও শাফে’য়ী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, রমাযান মাসের পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা এক বছর ফর্‌য রোযা পালনের সমান। অন্যথায় সাধারণ নফল রোযার ক্ষেত্রেও সওয়াব বহুগুণ হওয়া সাব্যস্ত। কেননা এক নেকিতে দশ নেকি দেয়া হয়।

কীভাবে ছয় রোযা রাখবেন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাওয়াল মাসের ভেতর ছয় রোযা রাখার কথা বলেছেন। মাসের প্রথম দিকে, মধ্যভাগে না শেষাংশে সে কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। আবার ছয়টি রোযা একসঙ্গে লাগাতার রাখতে হবে, না-কি বিরতি দিয়ে দিয়ে রাখতে হবে, সে কথারও কোনো উল্লেখ নেই। তাই বিজ্ঞ ফকীহ ও আলেমগণের অভিমত হলো, যেহেতু শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব এবং ওই দিনে রোযা রাখা হারাম, সেহেতু ঈদুল ফিতরের দিনটি বাদ দিয়ে মাসের যে কোনো ছয়দিনে রোযা রাখলেই উল্লিখিত সওয়াব লাভ করা যাবে।

শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার ফায়দা হচ্ছে– অবহেলার কারণে অথবা গুনাহর কারণে রমাযানের রোযার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে সেটা পুষিয়ে নেয়া। কিয়ামতের দিন ফর্‌য ‘আমলের কমতি নফল ‘আমল দিয়ে পূরণ করা হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের ‘আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন : আমাদের রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেন অথচ তিনি সবকিছু জানেন– তোমরা আমার বান্দার সালাত দেখো; সেকি সালাত পূর্ণভাবে আদায় করেছে না-কি নামাযে ঘাটতি করেছে। যদি পূর্ণভাবে আদায় করে থাকে তাহলে পূর্ণ সালাত লেখা হয়। আর যদি কিছু ঘাটতি থাকে তখন বলেন : দেখ আমার বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কিনা? যদি নফল সালাত থাকে তখন বলেন : নফল সালাত দিয়ে বান্দার ফর্‌যের ঘাটতি পূর্ণ করো। এরপর অন্য ‘আমলের হিসাব নেয়া হবে।[১৫]

---

[১৩] *আন্‌ নাসায়ী; আস্‌ সুনানুল কুবরা- ২৮৬২, মা. শা., ২৮৭৪।*

[১৪] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ২১১৫।*

[১৫] *সুনান আবূ দাঊদ।*

রমাযানের কাযা সিয়াম থাকলে করণীয় : কোনো ব্যক্তির উপর রমাযানের ফর্য সিয়াম কাযা রয়ে গেলে সে ব্যক্তির ফর্য সিয়ামগুলোর কাযা আদায়ের পূর্বে শাওয়ালের সিয়াম আদায় করা বৈধ কি-না?

এর জবাবে স্পষ্টতই বলা যায়– বিশেষ ওযরবশতঃ যাদের রমাযানের সিয়াম কাযা পড়ে যায় যেমন- মহিলাদের ঋতু অবস্থাকালীন বা নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় কিংবা কোনো ব্যক্তির অসুস্থতা বা সফরজনিত কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় –এমতাবস্থায় বৈধ রয়েছে রমাযানের সিয়ামের কাযা পরে আদায় করে নেয়া। ইমামগণের মাঝে এ প্রসঙ্গে মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও আল্লাহ তা'আলার আয়াত এ বিশেষ সুযোগকে অবারিত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত থাকলে বা সফরে পরিভ্রমণরত থাকলে পরবর্তী দিবসগুলোতে সিয়ামের কাযা আদায় করে নেবে।"[১৬]

এ মর্মে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বর্ণিত হাদীস প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

«كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ».

"আমার রমাযানের কাযা সাওম থাকত, শা'বান আসা পর্যন্ত তার কাযা আদায় করতে পারতাম না।"[১৭]

"এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ওয়াজিব কাযা আদায়ের ব্যাপারটিতে সুযোগ ও সময়ের প্রশস্ততা রয়েছে।"[১৮] আর ইতোমধ্যে শাওয়াল মাসে সুযোগ মতো ছয়টি নফল সাওম রেখে নেয়া যায়।

উপসংহার

রমাযানের রোযার পর পুনরায় শাওয়ালের রোযা পালন করা– এটি রমাযানের সিয়াম কবূল হওয়ার একটি আলামত। কেননা যখন আল্লাহ কোনো বান্দার 'আমল কবূল করেন তখন তাকে আরও একটি ভালো 'আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। রমাযান মাসে বান্দা যেসব 'আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেছে সেটা রমাযান শেষ হওয়ার সাথে শেষ হয়ে যায়নি; বরং রমাযানের পরও বাকি আছে, যতদিন পর্যন্ত বান্দা জীবিত আছে। অতএব, ঈদুল ফিতরের পর পুনরায় রোযা শুরু করা প্রমাণ করে রোযার প্রতি বান্দার অনেক আগ্রহ রয়েছে, সিয়াম দ্বারা তারা ক্লান্ত হয়নি এবং রোযাকে তারা অপছন্দ ও বোঝা মনে করেনি।

রমাযানের রোযার ফলে পেছনের সকল পাপ মোচন করা হয়। আর ঈদুল ফিতরের দিন রোযা পালনকারীদের প্রতিদান প্রদান করা হয়। অর্থাৎ- ঈদ হচ্ছে পুরস্কারের দিন। অতএব, পাপ মোচনের নিয়ামত শেষে শুকরিয়া হিসেবে শাওয়ালের রোযা রাখাই সঙ্গত। কারণ, পাপ মোচনের ন্যায় বড় কোনো নিয়ামত নেই। ☐

---

[১৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০।*
[১৮] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- আস্ সাইয়্যিদ সালিম, পৃ. ১২৬।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের প্রতিদান জান্নাত

(এক) আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো 'আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। যখন ঐ ব্যক্তিটি প্রত্যাবর্তন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, যদি সে তার ওপর 'আমল করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ***সহীহ্ মুসলিম- হা. ১৩।***

(দুই) জুবায়র ইবনু মুত্'ইম (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ***সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৬।***

সূচীপত্র ১

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তবায়ন সময়ের দাবি

–প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

বাংলাদেশ বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে সিলেবাসে কি থাকবে শিক্ষার্থীরা কি পড়বে তাদের বাস্তব জীবনে কি প্রতিফলনের দরকার এ বিষয়গুলো বলার অবকাশ আছে বলে প্রাজ্ঞজনরা মনে করেন না।

বাংলাদেশে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেই এ দেশের মুসলিমগণ নিজস্ব অর্থে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রচলন করে। ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষাসহ দেশের প্রচলিত সিলেবাস অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার বিষয়গুলোও সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিষয়গুলো পুরোপুরি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় খাঁটি আলেম তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে। তখন কওমি মাদ্‌রাসার উদ্ভব ঘটে।

মাদ্‌রাসা যেহেতু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই তাদের শিল্প-সংস্কৃতি সাহিত্য ইতিহাসে সব কিছুতেই ধর্মীয় প্রভাব থাকাটা অত্যাবশ্যকীয়। তা না হলে মাদ্‌রাসা পড়ে তারা কি শিখবে আর দেশ জাতিকেই বা ধর্ম সম্পর্কে কি দিক নির্দেশনা দিবে। কিন্তু বর্তমানে মাদ্‌রাসার সিলেবাসে ঈমান এবং মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্য বিধ্বংসী এক নীল নকশা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য গ্রন্থ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থে ইসলামিক সংস্কৃতি ঈমান 'আক্বিদাহ্ বিধ্বংসী এবং মুসলমানদের ইতিহাসে ইতিহাস বিকৃতির এক নগ্নথাবা পরিলক্ষিত হয়েছে। উঠতি বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যৌন সুড়সুড়ির এক হীন প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে পশ্চিমাদেশের মতো ফ্রী সেক্সের দেশে রূপান্তরিত করার এক হীন প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১. হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি শিশু মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ. অথচ মানুষের আত্মপরিচয়ে নাম, লিঙ্গ, বয়স, পছন্দের খাবার, পোশাক, খেলা, শখ উল্লেখ থাকলেও ধর্মের পরিচয় কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

২. ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্পর্শকাতর বিষয়গুলো লজ্জাহীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. ছেলেমেয়ে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কে জড়ালে শাসন করা উচিৎ নয়।

৪. ছেলে মেয়েতে বিবাহ পূর্বে কোনো বন্ধু হতে পারে না। অথচ বইতে সুন্দর 'একটি ছেলে বন্ধু তার মেয়ে বন্ধুকে স্পর্শ নিরাপদ স্পর্শ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পাঠের শিরোনাম, **চলো বন্ধু হই**। ছেলে ও মেয়ের ছবি দিয়ে বলা হয়েছে প্রয়োজনে না বলি, কী চাই তা বলি, অনুভূতি প্রকাশ করি। এখানে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের দিকেই উস্কে দেওয়া হয়েছে।

৫. সকল বইয়ের প্রচ্ছদে বাদ্য-বাজনার ছবি, ভেতরে হিজাব বিহীন ছবি, কখনো মহিলাদের অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৬. পহেলা বৈশাখ, গায়ে হলুদ, জন্মদিন পালন, মুখেভাত অনুষ্ঠান ইত্যাদি শির্ক বিদআতগুলো মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭. সালামের পরিবর্তে ইংরেজি বইগুলোতে good morning পরিভাষা স্থাপন করা হয়েছে।

৮. ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের নয়; শুধুমাত্র হিন্দুদের অবদান রয়েছে।

৯. ইংরেজ আমলে আলিয়া মাদ্‌রাসার মতো নবম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বই থেকে ইসলামের একটি ফরয বিধান জিহাদ বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে।

১০. বিশ্ব মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনের নাম ডিলিট করে অবৈধ ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিরাট এক চক্রান্ত চলছে। সেখানে অপর ধর্মের কুসংস্কৃতি ধর্মের নামে অপসংস্কৃতি মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শিশুদের মন মগজে অন্য কিছু ঢুকিয়ে ধর্মহীন করে দিতে বিশেষ একটি চক্র তৎপর।

আমি বাংলাদেশের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বিনীত অনুরোধ জানাতে চাই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত মুসলমান হিসেবে আপনিও ভালো জানেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ধর্মহীন করার নগ্ন প্রচেষ্টা আপনি প্রতিহত করবেন এটা দেশজাতির আশা। স্কুল কলেজ মাদ্‌রাসা সিলেবাসে মুসলিমদের ঈমান বিধ্বংসী যেসব বিষয় আছে তা অতিসত্বর প্রত্যাহার করে সে স্থানে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ক সবকিছু সিলেবাসে সংযুক্ত করে সিলেবাস পুনর্গঠন করুন।

এ দেশ আপনার আমার। আমাদের মুসলিম পূর্বপুরুষদের।

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের প্রতিফলন এটাই দেশজাতির কাম্য এর ব্যতিক্রমে যারা সচেষ্ট থাকবে তারা একদিন না একদিন ইতিহাসের আস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হবে। ❑

---

* *আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : শরয়ী ফায়সালা

–তানযীল আহমাদ*

ভূমিকা : ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। সারা বিশ্বের মযলুম শ্রমিকরা এদিনে সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং, প্রতিবাদ সভা ও র‌্যালি বের করাসহ নানান কর্মসূচি পালন করে থাকে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক নেতারাও সে সকল সভা-সমিতিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে অশিক্ষিত শ্রমিকদের করতালির আশায় তাদের পক্ষে গলা উঁচিয়ে, বুক ফুলিয়ে, হস্তদ্বয়ের বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গিমাসহ তেজস্বী বক্তৃতামালা পেশ করে থাকে। তাদের সে সকল বক্তৃতার চুম্বুকাংশ নোট করে আমাদের অতি আপনজন সাংবাদিক ভাইয়েরা খবরের কাগজে ছাপানোর মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। পরেরদিন প্রভাতে খবরের কাগজে এসব অগ্নিঝরা বক্তব্য পাঠ করেই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধার নানাবিধ আশ্বাসের বাণী তুলনামূলক কোমল কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থ বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো জ্ঞান না থাকায় শ্রমিকদল তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি শ্রম দিতে শুরু করেন। দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে শ্রমিক যখন তার বেতন-ভাতা বৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর থাকে তখন তাদের কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে মালিকপক্ষ নাইট ক্লাবে ফূর্তি করে। একদিকে ঝড়ো বৃষ্টির রাতে শ্রমিকের থাকার জায়গা হয় না, অন্যদিকে মালিকপক্ষের শ্বেতপাথরের সুরম্য অট্টালিকা আকাশ ছুঁতে থেমে থাকে না। একদিকে দরিদ্র শ্রমিকের অসহায় মা-বাবা চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, অন্যদিকে বড়লোক মালিক তার শরীরের চেক আপের জন্য প্রতি মাসে মাউন্ট এলিজাবেথ যায়। যখন অর্থাভাবে শ্রমিকের ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়, তখন মালিকের ছেলে-মেয়ে পড়াশুনার জন্য আমেরিকা-ইউরোপে পাড়ি জমায়। একদিকে শ্রমিক তার মৃত মা বাবার দাফন কাফনের খরচের জন্য হিমশিম খায়, অন্যদিকে মালিক তার মৃত মা বাবার জন্য কুলখানি করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। আমাদের সমাজ জীবনে এমনই উন্নতির জোয়ার বইছে। তৈলাক্ত মস্তকে তৈল মর্দনের যে সামাজিক চিত্র আমরা প্রতিনিয়ত অবলোকন করে চলছি তা কতদূর পর্যন্ত গড়াবে সেটাই আজকে চিন্তার বিষয়।

প্রেক্ষাপট : ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়ে আসছে। এর আগে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগোতে হে মার্কেটের সামনে দৈনিক আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। সরকারের গুণ্ডাবাহীনির গুলিতে সে দিন ১০/১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১লা মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

পুঁজিবাদের অভিশাপ : মূলতঃ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution)-এর দিকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দিতে সমুদ্র যাত্রা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে গীর্জার পোপ ও ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীদের মাঝে শুরু হয় আদর্শিক সংঘর্ষ। একপর্যায়ে গীর্জার অনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে সেখানে শিল্প বিপ্লব সংঘঠিত হয়। কৃষি ব্যবস্থা থেকে শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকে যায় ইউরোপ। যে ভূমিতে একমসয় সবুজ শষ্যাদি আবাদ হতো, সেখানে এখন বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করল। ধ্বংস হলো কুটির শিল্প। শিল্পপতিরা তাদের সমস্ত অর্থ ইনভেষ্ট করতে থাকল সেসব কারখানায়। কৃষকদের আবাদি জমিন কেড়ে নেয়া হলো, কুটির শিল্পের মালিকরা সর্বস্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে জীবিকার তাগিদে তারা শহরমুখী ও কারাখানায় কাজ করার জন্য ভীড় জমাতে শুরু করল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণি। নামমাত্র বেতনে শ্রমিকদের গাধার মতো খাটাতে শুরু করল তারা। আর করবেই না কেন? সমাজের এ সকল বুর্জোয়া শ্রেণির বিশ্বাস তাদের অকুণ্ঠ সমর্থক ম্যানডেভিলের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে–

“গরীবদের থেকে কাজ নেয়ার একটিই মাত্র পথ, আর তাহলো এদেরকে গরীব থাকতে দাও, এদেরকে পরনির্ভরশীল করে তোলো। এদের প্রয়োজন খুব অল্প করেই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজন পূরণে এদেরকে সাবলম্বী করা চরম বোকামী।”

পুঁজিবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা টাউনসেন্ড উক্ত ঘৃণ্য মনোভাবটি আরো সোচ্চার করতে যেয়ে বলেন,

---

*শিক্ষক : মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

“ক্ষুধার কষাঘাত এমন এক মারাত্মক অস্ত্র যা বন্য হতেও অবাধ্য পশুগুলোকে শান্ত-সুবোধ বানিয়ে ফেলে। এরই সাহায্যে অবাধ্য হতে অবাধ্যতর মানুষও বাধ্য ফরমাঁবদার হয়ে ওঠে। তাই তোমরা গরীবদের থেকে যদি কাজ নিতে চাও তবে এর একমাত্র উপায় এদেরকে ‘ভুখা’ রাখো। ক্ষুধাই এমন এক আবেদনময়ী বস্তু যা গরীব ও সর্বহারাদেরকে যে কোনো রকমের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।”[১৯]

শ্রমিকদের এমন করুণ দশা ও স্বল্প বেতনের অভিযোগে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বন্দ শুরু হয়। কিন্তু কথায় বলে, ‘টাকায় বাঘের চোখও মেলে’। রাজনৈতিক নেতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য বুর্জোয়া মালিকপক্ষের কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগদান করে আবার তাদের পকেট ভর্তি করার মাধ্যমে তাদরেকে খুশিও রাখে। এভাবে শিল্পপতিদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। ফলে স্বভাবতই শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। শিল্পায়ন ও রাজনীতির হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদ। মেহনতি মানুষের রক্তে গড়ে ওঠে শিল্পপতিদের অট্টালিকা। অবস্থা এত বেগতিক হয় যে, কোনো পণ্য বেশি উৎপাদন হলে তা ধ্বংস করা হতো, যেন বাজারে তার সহজলভ্যতা না হয়। যেহেতু বাজারে কোনো পণ্যের সহজলভ্যতা হলে মুনাফাখোরিরা তাদের ইচ্ছামত সেটার অতিমূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন না। এজন্য একবার ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হলো। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু বুর্জোয়ারা পড়ে গেল চিন্তায়। কারণ এত ফসল বাজারে উঠলে তাদের মজুতদারি করেও কোনো কাজ হবে না। তারা সিদ্ধান্ত নিলো এগুলোকে কিভাবে নষ্ট করা যায়? এত ফসল মাটিতে পুঁতে ফেলাও সম্ভব না আবার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়াও যাবে না। অবশেষে তারা উৎপাদিত ফসলকে পুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো। দুই লাখ পাউন্ড জ্বালানি তেল ব্যবহার করে ব্রাজিলে উৎপাদিত ফসলকে তারা পুড়িয়ে ফেলল। অরেকবার খাদ্য সংকট তৈরির জন্য তারা লিভারপুরের ২০০ নৌকা ডুবিয়ে দেয়।[২০]

সোশালিজমের ব্যর্থ চেষ্টা : সাদা চামড়ার সাম্রাজ্যবাদীরা পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে গোটা শ্রম বাজারকে পরোক্ষভাবে করায়ত্ত করে। শ্রমিকের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। এদিকে রাশিয়ায় শ্রমিকের উপর নির্যাতন আরো বৃদ্ধি পায়। দৈনিক আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তাদের। যুবক ও শিশু শ্রমিকের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। একজন মহিলা শ্রমিককে তার গর্ভাবস্থায়ও কাজ করতে হয়। ফলে মার্কসীজম সেখানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। মার্কসীজমের মূল কথা হলো, যার যার সাধ্য অনুযায়ী কাজ আদায় করে নিতে হবে আর তার প্রয়োজন মাফিক তাকে অর্থ যোগান দিতে হবে। প্রথম প্রথম এই মতটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। লাল চামড়ার রাশিয়ানরা এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে খুব গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে থাকে। রাশিয়ার শ্রমিকদের নিকটে কাল মার্কস হয়ে ওঠেন এক সংগ্রামী প্রতিক। পরবর্তীতে লেলিন সেই মতবাদকে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র রাশিয়ার সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শিষ্যরা কখনো একথা ভাবেনি যে, কাল মার্কসের এই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও তাদের চিরস্থায়ী কোনো সমাধান হবে না। শ্রমিকদের শুধু প্রয়োজন মিটলে তারা আজীবন বংশপরম্পরায় শ্রমিকই থেকে যাবে। তাদের মালিক হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝে যে সমস্যা তা বন্ধ হবে না। এজন্যই মনে হয় রাশিয়ায় ১৯৩৬ সালে পূর্বের আইন পরিবর্তন করে নতুন আইন পাশ করা হয়। নতুন আইনে বলা হয়, শ্রমিকের নিকট থেকে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ আদায় করতে হবে এবং তার কাজের পরিধি ও গুণগত মান বিবেচনা করে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু রাশিয়ান আইন প্রণেতা সোশালিজমের বোদ্ধারা টের পেয়েছেন কিনা যে, তাদের এই আইনে পুঁজিবাদেরই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কার্যত, যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কাল মার্কস সংগ্রাম করেছেন এবং তার ভাবশিষ্য লেলিন জেল খেটেছেন সেই পুঁজিবাদের দিকেই তাদের অনুসারীরা মোড় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে আমরা ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে চাই, ভারতের প্রখ্যাত ‘আলেমে দ্বীন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি বর্ণনা করেছেন : ‘আমি রাশিয়া সফরকালে লেলিনের সাথে সাক্ষাত হলে কথা প্রসঙ্গে তার কাছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করি।

“ইয়াসআলুনাকা মাযা ইয়ুনফিকুন কুলিল আফওয়া।”

“হে নবী! তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছুই।”

তখন লেলিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন– “আরো আগে যদি কুরআনের এই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোনো আবশ্যক ছিল না।”[২১]

---

[১৯]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ৭ পৃ.।*

[২০]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ৫ পৃ.।*

[২১]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ১৪ পৃ.।*

যাই হোক, শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্বে পরপর দু'টি মতবাদ, তথা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ তর্জন-গর্জন করলেও আধুনিককালে তাদের মতবাদের অসারতা আবারো প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই বোধ হয় এ যুগে এসেও শ্রমিকদেরকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়। পাওনা মজুরির জন্য মালিকপক্ষের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সরকারের পোষ্যবাহীনি নানা ধরনের উপঢৌকন প্রেরণ করে থাকে। ফলে আধুনিক বিশ্বের সকল সম্পদ মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ লোকের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। অর্থাৎ- বিশ্বের সাতশ কোটি মানুষ মাত্র দশ ভাগ লোকের নিকটে জিম্মি।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা : শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম এমন কিছু সৌন্দর্যপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা পেশ করেছে, যা বিশ্বের কোটি কোটি মযলুম মেহনতি শ্রমিকের সামনে আলোর দ্যুতি ছড়াবে। নিরাশার চাদরে ঢাকা খেটে খাওয়া নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের সামনে আশার প্রদীপ হয়ে থাকবে। কিন্তু ইসলামের নাম শুনলেই একশ্রেণির লোকদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। ইসলামের সুনির্মল, স্বচ্ছ ও কালজয়ী আদর্শের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করাই তাদের কর্মসূচি। ফলে ইসলামের শ্রমব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমুখী হলেও তা তাদের সহ্য হয়নি, হবেও না। বঞ্চিত মানুষের পক্ষে ইসলামের যে দরদমাখা অবস্থান তা যদি তারা মেনে নিত তাহলে কতই না ভালো হত! আমরা যদি ভারতে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে সাদা চোখেই দেখতে পাব, ইসলাম আগমনের প্রাক্কালেই এখানকার দলিত সম্প্রদায় ও নিম্নশ্রেণির দরিদ্ররাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্পেনে মুসলিমদেরকে শ্রমিকশ্রেণিই স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি মক্কায় ইসলামের সূচনালগ্নে দাস ও দরিদ্রশ্রেণিই তা গ্রহণ করেছিল। ইসলামে মানবাধিকারের সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন সাহাবি জা'ফার ইবনু আবূ তালিব (রযিয়াল্লাহু আনহু) যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী তাকে নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন,

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِيْ الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ، فَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى بَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْنَا رَسُوْلًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، «فَدَعَانَا إِلَى اللّٰهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّوْرِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيْمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ.

অর্থ : হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কর্মকাণ্ডে ডুবে ছিলাম ও প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। আর আমাদের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বলদেরকে বঞ্চিত করে রাখত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকটে আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন– যার বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আমরা সম্যক অবগত। তিনি আমাদেরকে মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যে গাছ পূজা ও পাথর পূজা করত তা থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে বলেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন সত্য বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে। তিনি নিষেধ করেছেন হারাম কাজে লিপ্ত হতে, রক্তপাত করতে, অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়তে, মিথ্যা বলতে, ইয়াতিমের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করতে এবং সতী-সাধ্বী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিতে।[২২]

এই হাদীস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, সাহাবি জা'ফার (রযিয়াল্লাহু আনহু) একজন খ্রিষ্টান শাসকের নিকটে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন মানবতাবাদী হিসেবে। যিনি মানুষকে ভালো আচরণের কথা বলেন, আমানত রক্ষার সদুপদেশ দেন, সত্যের নির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং তিনি তার অধিনস্তদের সাথে কিরূপ আচরণ করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আসুন! আমরা জেনে নেই দুনিয়ার মযলুম মেহনতি মানুষের জন্য মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছেন–

০১. মালিক শ্রমিক ভাই ভাই : একদা আবূ যার (রযিয়াল্লাহু আনহু) তার এক দাসকে ভর্ৎসনা করলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, হে আবূ যার! তুমি এমন একজন ব্যক্তি যার মাঝে এখনো জাহিলি স্বভাব বিদ্যমান। এরপর তিনি বলেন :

«إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ».

---

[২২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৭৪০।*

‘নিশ্চয় তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপরে তোমাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন।’[২৩]

উল্লিখিত হাদীসে নবী (ﷺ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন :

◆ দাস, শ্রমিক বা অধস্তন কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা জাহিলী স্বভাব।

◆ মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই ভাই।

০২. শ্রমিকের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে : সাহাবী আনাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর দশ বছর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে বলেননি যে, তুমি কেন এটি করলে আর কেন এটি করলে না!!![২৪]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার এক দাস রয়েছে। সে আমাকে বিরক্ত করে ও গালি দেয়। আমি কি তাকে প্রহার করতে পারব? নবী (ﷺ) বললেন,

تَعْفُوْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

‘তুমি প্রতিদিন তাকে সত্তর বার ক্ষমা করতে থাকো।’[২৫]

০৩. মালিক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান : ইসলামের সাম্যনীতি আসলেই অবাক করার মতো। সেই যুগে ক্রীতদাসের যে করুন অবস্থা বিরজিত ছিল সে কঠোরনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে নবী (ﷺ) ঘোষণা করেন,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

‘তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের সেবক। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার অধীনে কোনো সেবক রয়েছে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে যেন সেই মানের পোষাক পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে।’[২৬]

ইসলামই মনে হয় পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যেখানে শ্রমিকদের পক্ষে এমন সমতার কথা বলা হয়েছে।

০৪. শ্রমিকের নির্ধারিত বেতন ছাড়াও উৎপাদিত পণ্যের কিছু **অংশ দেয়া :** নবী (ﷺ) বলেন,

«إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ».

‘যখন তোমাদের খাদেম খাবার নিয়ে আসে তখন যেন সে তাকে তার সাথে বসায় অথবা তার হাতে খাবার তুলে দেয়। কেননা খাবার তৈরির যে তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট তা খাদেমকেই সহ্য করতে হয়েছে।’[২৭]

এখানে আমরা মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন,

‘এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিজের শ্রমের সাহায্যে মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটাইয়া যাহা উৎপন্ন করিবে, তাহা হইতে তাহাকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার পরও আসল মুনাফা হইতে তাহাকে কিছু না কিছু অংশ দিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত ঘরের বাবুর্চি আর কারখানার শ্রমিকের মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। একজন বাবুর্চিকে খাদ্য পাকাইবার কাজে যেভাবে মনযোগ দিতে হয়, দেহ ও চিন্তা শক্তিকে যেভাবে নির্দিষ্ট এক কাজের জন্য নিয়োজিত করিতে হয়, কম-বেশি প্রায় তদ্রুপই কারখানার একজন মজুরকেও খাঁটিতে হয়। কাজেই এই হাদীস অনুসারে নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য হইতে অংশ পাইতে পারিবে। যে মিলে কাপড় তৈরি হয়, প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার পরিবারবর্গের জন্য বৎসরে এক বা একাধিকবার কাপড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কোনো মিলে শ্রমিক সকাল-সন্ধা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া থানকে থান কাপড় বুনে অথচ তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের লোকদের পরিধানে হয়ত ছিন্নবস্ত্রটুকুরও অস্তিত্ব নেই। এই হাদীস অনুসারে ইসলামী সমাজে যে শ্রমনীতি কায়েম করা হইবে তাহাতে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকিতে পারিবে না।’[২৮]

০৫. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“আল্লাহ তা‘আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না।”[২৯]

নবী (ﷺ) বলেন,

«وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ».

---

[২৩]. *সুনান আবু দাঊদ- হা. ৫০৬৭, মা. শা., হা. ৫১৫৭, সহীহ।*
[২৪]. *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৬৮।*
[২৫]. *মুসনাদে অহমাদ- হা. ৫৬৩৫, সহীহ।*
[২৬]. *সহীহ বুখারী- হা. ৩০।*
[২৭]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩২৯১।*
[২৮]. *ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার- ২৬ পৃ.।*
[২৯]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*

‘তার সাধ্যশক্তির অতীত কোনো কাজের চাপ যেন তাকে না দেয়। দিলে সে কাজ সমাধা করার ব্যাপারে যেন তাকে যথাযথ সহযোগিতা করে।’[৩০]

সহযোগিতার অর্থ এই নয় যে, আপনাকেই কারখানায় গিয়ে তাদের সাথে কাজ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, আপনি সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দিবেন, ভালো মানের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করবেন, শ্রমিককে পর্যাপ্ত সময় দিবেন এমনকি তাদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুস্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

উপসংহার : ইসলামের এই শ্রমনীতি যদি মালিকপক্ষ মেনে চলত তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কাল মার্কস, লেলিন অথবা মাও সে তুংয়ের ভুয়া কমিউনিজমের জন্য শ্রমিকশ্রেণি এত আন্দোলন, হরতাল, অবরোধ বা ধর্মঘট করত না। তার ইসলামের ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি মেনে নিয়ে আরামে জীবন-যাপন করতে পারত। কিন্তু কে শুনে কার কথা।

বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অক্টোপাসের মতো মালিকপক্ষের অবস্থাদৃষ্টে অনেক আগে পড়া বাংলাদেশের প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমাদের ফুড কনফারেন্সের গল্পটি মনে পড়ে গেল। গল্পটি মোটামুটি এমন...

সারাদেশে দুর্ভিক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষুধা আর রোগে মানুষ এবং পশুপাখির একাকার অবস্থা। রাজধানী ঢাকায় কাঙ্গালের দল ছুটে এসেছে দু’মুঠো ভাতের আশায়। ভুখা-নাঙ্গা মানুষের কারণে সমাজের সাহেবগণ রাস্তায় বেরও হতে পারছিলেন না। আগে যেখানে গাউন শাড়ি পরা মহিলারা হাঁটত এখন সেখানে অর্ধ উলঙ্গ ছেঁড়া কাপড়ে পল্লীর মা মেয়ের অবস্থান। বাবুরা যেখানে আগে প্রাত্যহিক ব্যায়ামের জন্য গমনাগমা করত এখন সেখানে ভিক্ষুকের দলের প্রচণ্ড ভীর। রাজধানীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে পরিবেশবাদীরাও থেমে নেই। এর একটা বিহিত করা চাই। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের মাথামুণ্ড টাইপের ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এলেন। সারাদেশে রিলিফের মাল বিতরণের জন্য সবাই একাট্টা হলেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করলেন শেরে বাংলা। তার পাশে অন্যান্য আসন অলংকৃত করলেন বিল্লিয়ে বাংলা, কুত্তায়ে বাংলা, শিয়ালে বাংলা, ছাগলে বাংলা, গাধায়ে বাংলা, হাতিয়ে বাংলা, টাট্টুয়ে বাংলাসহ আরো অনেকে। একমাত্র মানুষে বাংলা সেই কনফারেন্সে অনুপস্থিত ছিল। ফলে কনফারেন্সের সর্বশেষ স্লোগান হলো– জানোয়ারে বাংলা জিন্দাবাদ, মানুষে বাংলা মুর্দাবাদ। ❑

---

[৩০] *. সহীহুল বুখারী- হা. ২৪০৭।*

যে নারীর আর্তনাদে ওহী নাযিল হয়

[২৫ পৃষ্ঠার পর]

‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র সাথে খাওলা (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)’র কাহিনী

জারীর ইবনু হাযেম বলেন, আমি আবূ ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, খাওলা বিনতু সালাবাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) ‘উমারের সাথে সাক্ষাৎ করেন যখন তিনি লোকদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ মহিলা তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি দাঁড়ালেন ও তার নিকটে গেলেন। অতঃপর যতক্ষণ না মহিলা তার কথা শেষ করলেন ও ফিরে গেলেন, ততক্ষণ তিনি তার সাথে কথা বললেন। তখন একজন সাথী খলীফাকে বলল, হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি কুরায়েশের সম্মানী ব্যক্তিদেরকে এই বৃদ্ধার জন্য আটকে রাখলেন? জবাবে খলীফা বললেন, তোমার দুর্ভোগ! তুমি কি জানো এই মহিলা কে? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, ‘ইনি হলেন সেই মহিলা সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ যার অভিযোগ শ্রবণ করেছিলেন। ইনি হলেন খাওলা বিনতু সালাবাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)। আল্লাহর কসম! যদি তিনি কথা শেষ না হওয়ার জন্য রাত্রি পর্যন্ত ফিরে না যেতেন, তথাপি আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কেবল সালাতের জন্য ব্যতীত। আবার তার কাছে ফিরে আসতাম। যতক্ষণ না তার প্রয়োজন শেষ হত’।[৩১]

শিক্ষণীয় বিষয়

১. আল্লাহ তা‘আলা মানুষের উঁচু স্বরের ও নীচু স্বরেরসহ সকল কথা শুনতে পান এমনকি তিনি অন্তর্যামী।

২. বান্দার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ। তিনি মহিলা সাহাবীর অভিযোগ শুনলেন এবং সুন্দর সুষ্ঠু সমাধান দিলেন আর বিধানটি সকলের জন্য প্রযোজ্য করে দিলেন।

৩. যিহার শুধু স্ত্রীর সাথে হয়, অন্য কোনো নারীর সাথে হয় না।

৪. যদি স্ত্রীকে মা অথবা এমন কোনো নারীর অঙ্গের সাথে তুলনা করা হয় যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম তাহলে যিহার বলে গণ্য হবে।

৫. স্ত্রীকে মাহরাম নারীদের সম্বোধনে ডাকা নিষেধ। যেমন- স্ত্রীকে এরূপ বলা যে, হে আমার মা, হে আমার বোন ইত্যাদি।

৬. স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বেই উল্লিখিত তিনটির কোনো একটি কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব।

৭. কেউ যিহারের কাফ্ফারাস্বরূপ মিসকীনকে খাওয়াতে চাইলে অবশ্যই ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। ষাটজনের খাবার একত্রিত করে একজন বা একাধিকজনকে দিলে শরীয়ত সিদ্ধ হবে না। *[তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ- সম্পাদনায়- ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ খান মাদানী]*

---

[৩১] *তা. ইবনু কাসীর; কুরতুবী; ইবনু আবী হাতিম- ১৮৮৪১।*

সূচীপত্র

কখন ফিলিস্তিন আমাদের নিকট ফিরে আসবে

মূল : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ রসলান

অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ও আব্দুল্লাহ[★]

প্রাককথন

প্রসংশা মাত্রই আল্লাহ তা‘আলার জন্য –আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকটেই সাহায্য চাচ্ছি, ক্ষমা প্রার্থনাও করছি তাঁর কাছেই এবং আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ কর্মফল থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তা‘আলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে সুপথ দেখানোরও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্যিকারার্থে কোনো মা‘বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।”[৩২]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ব দাবি করো এবং ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।”[৩৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ○ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ‘আমলকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”[৩৪]

অতঃপর আল্লাহর কিতাবই হলো সর্বাপেক্ষা সত্য বাণী। রাসূল ﷺ দিক-নির্দেশনাই হলো সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতর বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়। আর দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়ই হলো বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই হলো গোমরাহি। আর প্রত্যেক গোমরাহিই হলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

পরকথা হলো– সাবেক মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ আল আমিন আল হুসাইনীর সাথে একদল ফিলিস্তিনীর সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, শাইখ! আমরা কবে আমাদের ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে পারব?

তখন তিনি বললেন, যে দিন তোমরা আল্লাহ তা‘আলার দিকে (সম্পূর্ণরূপে) ফিরে যাবে সে দিন তোমরা ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে পারবে।

কবে আমরা ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে পারব?

বর্তমানে পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষই হোক না কেনো সে যদি জানতে চায় যে, আমাদের ফিলিস্তিন কখন আবার আমাদের হাতে ফিরে আসবে?

এর জওয়াবে আমি সেই উত্তরই দিব, যে উত্তর সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ আল আমিন দিয়েছিলেন। আর তা হলো– যে দিন আপনারা আল্লাহর দিকে (সম্পূর্ণরূপে) ফিরে যাবেন সেদিন আপনাদের নিকট ফিলিস্তিন ফিরে আসবে। আর এ উত্তরটি রাসূল ﷺ মুখনিঃসৃত বাণী থেকেই গৃহীত। যেমনটি ইমাম আহমাদ ও আবূ দাঊদ

[★] *মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৩২] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ২।*

[৩৩] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

[৩৪] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৭০-৭১।*

সাওবান (রযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল ([illegible]) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الأمم، كما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. قالوا : أَوَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يا رسول الله؟ فقَالَ : لا إنكمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلَكِن كثرة غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ الرهبة منكم مِنْ قلوب أعدائكُمُ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهَنَ. قالوا : وما الوهن يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ "حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".

খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এরূপ হবে? তিনি বললেন, না; বরং তোমরা সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে আতঙ্ক দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে 'আল ওয়াহন' ভরে দিবেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'আল-ওয়াহ্ন' কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[৩৫]

সুতরাং আমরা যেদিন আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যাব সেদিন তিনি আমাদের হারিয়ে ফেলা জিনিসগুলো আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু যদি রবের সাথে আমাদের দূরত্ব বাড়তেই থাকে তবে আমাদের অধীনস্থ, কর্তৃত্বাধীন যা কিছু আছে তা-ও একসময় হারিয়ে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মহা মহিমান্বিত কুরআনে এরূপই ফয়সালা করে রেখেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

"আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে জেনে রেখ, নিশ্চয় আমার শাস্তি বড় কঠিন।"[৩৬]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, কোনো নিয়ামতের নাশুকরি সে নিয়ামতকে দূরীভূত করে দেয়। তিনি আয়াতে বললেন, তোমরা যদি আমার নিয়ামতকে অস্বীকার করো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করো, আর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে সেটাকে ধরে না রাখো (তবে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব)। কেননা বিষয়টি তেমনই যেমনটি রাসূল ([illegible]) বলেছেন যে, "নিয়ামত হলো শিকার এবং শুকরিয়া হলো বন্ধন বা রশি" আর আলেমগণও এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটিই বলেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত দেন এবং সে বান্দা চায় যে, এ নিয়ামতটি স্থায়ী হোক, উঠে না যাক তাহলে তার উপর আবশ্যক হলো, এ নিয়ামতের কারণে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কিন্তু যদি সে শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে গড়িমসি করে তবে তার থেকে সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং এ কারণে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফয়সালা এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে তাঁর একটি বিধান (লা হাওলা ওয়ালা কুউওতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম)।

কখন আমাদের নিকট ফিলিস্তিন ফিরে আসবে?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হলো– যেদিন আমরা মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাব সেদিন ফিলিস্তিন আমাদের নিকট ফিরে আসবে। নবী ([illegible])-ও তার হাদীসে আমাদেরকে এমনটিই জানিয়েছেন। কেননা তিনি বলেছেন যে, উম্মত যখন রবের দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যায়, নবীর সুন্নাহকে ছেড়ে দেয় তখন তাদের উপর নেমে আসে লাঞ্ছনা। চারিদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ধরে অপদস্থতা। রাসূল ([illegible]) বলেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

যখন তোমরা 'ঈনা[৩৭] পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং

---

[৩৫] আহমাদ- হা. ২১৮৯১; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪২৯৭; সহীহুল জামে'- হা. ৮১৮৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ।

[৩৬] সূরা ইব্রা-হীম : ৭।

[৩৭] 'ঈনা' বলা হয়– প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক দামে ক্রয়-বিক্রয় করা।

সূচীপত্র

জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।[৩৮]

সুতরাং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যাতিত হারানো সম্মান ফিরিয়ে নিয়ে আসা ও গৌরব অর্জন করা সম্ভব নয়।

حَتّٰى تَرْجِعُوْا إِلٰى دِيْنِكُمْ.

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসো।

এর মর্মার্থ হলো– যতক্ষণ না আপনারা সে দ্বীনে ফিরে আসেন যে দ্বীন নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) আগমন করেছিলেন। যতক্ষণ না আপনারা সে পথে ফিরে আসেন যে পথ দেখিয়েছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

বর্তমানে ফিলিস্তিনের গাজায় যেটা ঘটছে সেটা কেবল ত্রান বিতরণ ও মানবিকতা প্রদর্শনের বিষয় নয়। ব্যাপারটা এমন না যে, যারা ধনবান দানশীল আছেন তাদেরকে ফিলিস্তিনিদের জন্য শুধু অনুদান ও ত্রান বিতরণ করতে বলবো। এটা তো 'আক্বীদাহ্গত ইস্যু। মূলত এটি 'আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। দ্বীনের মূল অংশের সাথে জড়িত একটি বিষয়।

এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা মুসলিমদের পক্ষ থেকে কাফিররা করছে; বরং এ 'আক্বীদাহ্গত অধঃপতন মুসলিমদের নিজের হাতেরই কামাই। কেননা (ফিলিস্তিনি ইস্যুর প্রতিকারের লক্ষ্যে) বাহ্যিকভাবে যে কর্মসূচিগুলো পুরো বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে এর কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না। কারণ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পন্থায় কাজ করা হচ্ছে না। কিন্তু কেনো?

যারা চক্ষুষ্মান, বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের নিকট এর কারণটা স্পষ্ট। এর কারণ হলো এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা শরয়ী পদ্ধতিতে হচ্ছে না। আর যে পদ্ধতিতে বর্তমানে করা হচ্ছে সে পদ্ধতিতে রাসূল (ﷺ)-ও আমাদেরকে করতে বলেননি।

ফিলিস্তিনের ইস্যুটা কেবল দান করার ইস্যু নয় যে, এর জন্য অনুদান তহবিল গঠন ও সাহায্য সংগ্রহ করা হবে। পোশাক-আশাক ও ত্রাণ সামগ্রী জমা করা হবে। এগুলো হলো– বাহ্যিক বিষয়ের প্রতিকার; আসল রোগকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলা নয়। শরীয়ত কখনো এভাবে প্রতিকার করা শিক্ষা দেয় না।

হ্যাঁ, তবে মযলুমদের জন্য পোশাক-আশাক ও ত্রাণ সংগ্রহ করা ওয়াজিব। মানুষের কাছ থেকে এটি কাম্য। কিন্তু এটাই মূল বিষয় নয়। আমাদের জন্য মোটেও উচিত নয় মূল মাসআলা তথা তাওহীদ ভুলে যাওয়া। মূল রোগের প্রতিকার করতে গড়িমসি করা। আসল রোগকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলতে বিলম্ব করা কখনোই উচিত নয়।

আর আমাদের আবশ্যক কর্তব্য হলো– হঠাৎ আপতিত সমস্যার সমাধানে সদা প্রস্তুত থাকা। আর এ সমস্ত সমস্যাগুলো বারবার মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। কেননা রোগটি মূলত মুসলিম উম্মাহর পিঠকে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

কোনো একপ্রান্তে সমস্যা একটু স্তিমিত হচ্ছে তো অপর প্রান্তে অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। জাতীর শত্রুরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস সাধনের অভিপ্রায়ে তাদের উপর উন্মাদের মতো ঝাপিয়ে পড়ছে। রাসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন– আর তিনি তো সবচেয়ে সত্যবাদী– নির্দ্বিধায় বিনা পয়সার খাদকরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, তোমাদের ধ্বংস সাধনের অভিপ্রায়ে পৃথিবীর সকল প্রান্তের বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই একত্রিত হবে। বস্তুত মনে হবে মুসলিম উম্মাহ যেন এক প্রাপ্ত গনিমত, খাওয়ার জন্য পেশকৃত গোশ্ত, লুণ্ঠিত সম্পদ যার কোনো রক্ষাকারী নেই, নেই কোনো তদারককারী।

নিশ্চয় নবী (ﷺ) আমাদেরকে মূল রোগ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং মূল রোগের চিকিৎসা বাদ দিয়ে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতিকার নিয়ে ডুবে থাকা আমাদের মোটেও উচিত নয়। যেখানে সেখানে হামলা করে বেড়ানোটাও অনুচিত। কেননা এ হামলার মাধ্যমে কোনো এক স্থানের ক্ষত কমে কিন্তু মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা অন্য স্থানে আরো রক্ত ঝরায় এবং তারা মুসলিমদেরকে মূল রোগের প্রতিকার করা থেকে বিরত রেখে বাহ্যিক বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। যার কারণে বিষয়টি আরো খারাপ আকার ধারণ করে। ❑

---

[৩৮] *আবূ দাঊদ- হা. ৩৪৬২, সহীহাহ্- হা. ১১, আলবানী সহীহ।*

সূচীপত্র

আলোকিত জীবন

স্বর্ণাক্ষরে লেখা যাদের নাম : ইমাম ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ আদ্ দারেমী (রাহিমাহুল্লা-হ)

লেখক : হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রাহিমাহুল্লা-হ)

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আসারি

হেরাত হলো আফগানিস্তানের (সাবেক খোরাসান) বিখ্যাত শহর। এই শহরের প্রচুর বাগান এবং মিঠা পানির সহিত জান্নাতের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়। ইসলামের সোনালী যুগে এ শহরে অনেক আইম্মায়ে দ্বীন এবং উলামায়ে হক্ব-এর বাসস্থান ছিল। ইমাম হুসাইন ইবনু ইদ্রিস আনসারি আল হারওয়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) (মৃ-৩০১ হিজরি), বিখ্যাত সিকাহ হাফিয এবং অসংখ্য কিতাবের লেখক এই শহরের-ই অধিবাসী ছিলেন। যাম্মুল কালাম এর মতো অমর গ্রন্থের লেখক শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমা‘ঈল আল হারওয়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) (মৃ-৪৮১ হিজরি)-এর বাসস্থানও ছিল এই শহর।

ইমাম ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ বিন খালিদ, আবূ সা‘ঈদ দারেমী আল হারওয়ী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র উলূম ও বারাকাত এই শহরেই প্রজ্জ্বলিত ছিল। তিনি ২০০ হিজরি এর কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯] তিনি ধারাবাহিকভাবে ইসলামী দুনিয়ার আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে ‘ইল্ম ও হিকমতের সমুদ্রসমূহে ডুবে থাকা অব্যাহত রেখেছিলেন। হারামাইন, হিজায, শাম, মিশর, ইরাক এবং পারস্যে হাদীস ও বিভিন্ন শাস্ত্রে মাশহুর উলামাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

‘ইল্মে হাদীসে উনার কিছু বিখ্যাত উস্তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

আবুল ইয়ামান হাকাম ইবনু নাফি‘, সা‘ঈদ ইবনু আবী মারইয়াম, মুসলিম ইবনু ইব্রাহীম, সুলাইমান ইবনু হারব, আবূ সালামাহ্ আত্ তাবুজকী, নু‘য়াইম ইবনু হাম্মাদ আস্ সদুক্ব, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সলেহ আল কাতিব আল লাইস, মুসাদ্দাদ, আবূ তাওবাহ্ হালবী, আবূ জাফর নুফাইলী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ‘আলী ইবনুল মাদিনী, ইসহাক্ব ইবনু রাহাওয়াই, আবূ বক্র ইবনু আবী শাইবাহ্ প্রভৃতি (রহিমাহুমুল্লাহ আজমাইন)।

বিখ্যাত ভাষাবিদ ইমাম ও মুহাদ্দিস আবূ সা‘ঈদ ইবনুল আরাবি’র থেকে আদব (‘ইল্মে লুগাত প্রভৃতি) এবং ফক্বিহ আবূ ইয়াক্বুব আল বুয়ূত্বী থেকে ফিক্বহুল হাদীস শিখেছেন।

তাঁর পরশে ধন্য যারা : আবূ ‘আম্র আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল হিরী, মুয়াম্মাল ইবনুল হাসান আল মাসিরজিসী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল হারওয়ী আল ফাক্বিহ, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ‘আব্দুস্ ত্বারাইফী, শাইখুল ইসলাম আবূ নাদ্বার মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত ত্বূসী আল ফাক্বিহ, হামিদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ‘আব্দুল্লাহ আর রফ্ফা’, মুহাম্মাদ ইবনু ‘উসমান ইবনে সা‘ঈদ আদ্ দারেমী এবং আবুল ফাযাল ইয়াক্বুব ইবনু ইসহাক্ব আল ক্বর্রাব প্রভৃতি (রহিমাহুমুল্লাহ আজমাইন)।

উলামায়ে আহলে হক্ব-এর নিকটে উনার ‘ইল্মী মর্যাদা : সকল মুহাদ্দিস এবং হক্বপন্থী আলেম তাঁর তাওসিক ও প্রসংশার উপরে ঐক্যবদ্ধ–

১. হাফিয ইবনু হিব্বান উনাকে ‘কিতাবুস্ সিকাত’-এ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন :

أحد أئمة الدنيا.

“তিনি দুনিয়ার ইমামদের মধ্য হতে একজন ইমাম ছিলেন।”[৪০]

২. আবুল ফাযাল ইয়াক্বুব ইবনু ইসহাক্ব আল ক্বর্রাব (মৃ. ৩৩২ হি.) বলেছেন :

مارأينا مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي والحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه العلوم – (رحمة الله عليه).

---

[৩৯] *দেখুন : সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা- ১৩/৩১৯।*

[৪০] *কিতাবুস্ সিকাত- ৮/৪৫৫।*

“আমরা ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ (আদ্ দারেমী)-এর মতো আর কাউকে দেখিনি, আর না তিনি নিজের মতো কাউকে দেখেছেন। তিনি ইবনুল ‘আরাবি এর কাছ থেকে ‘ইল্‌মে আদব শিখেছেন, বুয়ূতী এর কাছ থেকে শিখেছেন ফিক্বহ এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও ইবনুল মাদিনী থেকে শিখেছেন হাদীসের ‘ইল্‌ম। তিনি এইসকল উলূমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন (রহিমাহুমুল্লাহ আজমাইন)।”[৪১]

৩. হাকিম নিশাপুরী ‘উসমান আদ্ দারেমী’র বর্ণনাকৃত হাদীসকে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।[৪২]

ইমাম হাকিম একটি সনদের সকল রাবীদের সিকাহ বলেছেন। সেই সনদে ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদও রয়েছেন।[৪৩]

৪. ইবনুল জাওযী বলেছেন :

امام عصره بهراة.

“তিনি হেরাতের ইমামুল ‘আসার।”[৪৪]

৫. হাফিয যাহাবি বলেছেন :

الإمام العلامة الحافظ الناقد.

“তিনি ইমাম, আল্লামা, হাদীসের হাফিয, নাক্বিদ।”[৪৫]

তিনি আরো বলেছেন :

الحافظ الإمام الحجة.

“তিনি হাদীসের হাফিয, ইমাম, হুজ্জাত।”[৪৬]

আরো বলেছেন :

وكان لهجا بالسنة، بصيرا بالمناظرة.

“তিনি সুন্নাতের অনুরাগী ছিলেন (এবং) মুনাযারার বিচক্ষণতা রাখতেন।”[৪৭]

আরো বলেছেন :

وكان جذعًا في أعين المبتدعة، قيما بالسنة.

“তিনি বিদআতিদের চোখের কাটা ছিলেন এবং সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।”[৪৮]

৬. আস্ সাফাদি বলেছেন :

وكان جذعًا في أعين المبتدعين.

“তিনি বিদআতিদের চোখের কাটা ছিলেন।”[৪৯]

৭. আব্দুল ওয়াহাব তাক্বিউদ্দিন আস্ সুবকি বলেছেন :

محدث هراة وأحد الأعلام الثقات.

“তিনি হেরাত এর মুহাদ্দিস এবং সিকাহ উলামাদের মধ্য হতে একজন ছিলেন।”[৫০]

৮. আল আবাদি তাবাক্বাত-এ বলেছেন :

الإمام فى الحديث والفقه.

“তিনি হাদীস ও ফিক্বহ এর ইমাম ছিলেন।”[৫১]

وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية وطردوه عن هراة.

“তিনি (ফিরকায়ে মুজাসসিমাহ-এর নেতা) মুহাম্মাদ ইবনু কার্রামকে দমন করেছিলেন –যার দিকে ফিরকায়ে কার্রামিয়াহ সম্পৃক্ত করা হয় এবং হেরাত থেকে বিতারিত করেছিলেন।”[৫২]

৯. ইবনুল ইমাদ বলেছেন :

وكان ... ثقة حجة ثبتا.

“তিনি ... সিকাহ, হুজ্জাত (এবং) সাবেত ছিলেন।”[৫৩]

১০. আল ইসনাওয়ী বলেছেন :

هو أحد الحفاظ الأعلام، تفقه على البويطي وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير.

“তিনি বিখ্যাত হাদীসের হাফিযদের মধ্য হতে একজন ছিলেন। তিনি বুয়ূতী থেকে ফিক্বাহ শিখেছেন এবং

---

[৪১] *তারিখে দিমাশক্ব লি ইবনু আসাকির- ৪০/২৬৫, সনদ সহীহ; উলূমুল হাদীস লিল হাকিম- পৃ. ৮০, হা. ৭৪; ওয়া বায়া’য আল ইসলাহ মিনহু।*

[৪২] *মুস্তাদরাক- ১/৪৬, হা. ১৪৩ ও ফিক্বহুয যাহাবী।*

[৪৩] *দেখুন : মুস্তাদরাক ১/৫১, হা. ১৬৫।*

[৪৪] *আল মুনতাযীম- ১১/১১২।*

[৪৫] *সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা- ১৩/৩১৯।*

[৪৬] *তাযকিরাতুল হুফফায- ২/৬৩১-৬৪৮।*

[৪৭] *সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা- ৩/৩২০।*

[৪৮] *আল ই’বার ফী খবার মান গবার- ১/৪০৩।*

[৪৯] *আল ওয়াফি বিল ওয়াফাইয়াত- ১৯/৩২০।*

[৫০] *তাবাক্বাতুশ শাফেয়ীয়্যাহ- ২/৫৩।*

[৫১] *তাবাক্বাতুশ শাফেয়ীয়্যাহ- ২/৫৩।*

[৫২] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৫৩।*

[৫৩] *শাযরাতুয যাহাব- ২/১৭৬।*

হাদীস সংকলন করার জন্য সুদূর প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। তিনি মুসনাদে কাবীর নামে একটি হাদীসের কিতাব লিখেছেন।”[৫৪]

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ‘আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম আর্ রাযী উনাকে কিতাবুল জারহি ওয়াত্ তা’দিলে (৬/১৫৩) উল্লেখ করেছেন এবং কোনো জারাহ বা তা’দিল করেননি।

এখানে এই কথাটি অদ্ভুত যে, যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দি সাহেব লিখেছেন :

سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي توثيق له. :

“কোন রাবীর ব্যাপারে জারাহ করা হতে ইবনু আবী হাতিম বা ইমাম বুখারীর চুপ থাকা তাকে সেকাহ বলার নামান্তর।”[৫৫]

এই ক্বওলটি যদিও বাতিল, কিন্তু দেওবন্দি ও ফিরকায়ে কাওসারীয়াহদের নিকটে হুজ্জাত। কাওসারী পার্টিতে যাফর আহমাদ সাহেবের অনেক বড় অবস্থান রয়েছে।

এই তাহ্ক্বীক্ব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ আদ্ দারেমী’র তাওসিক ইমামত ও জালালতের উপর সবাই একমত।

ইমাম ‘উসমান আদ্ দারেমী’র গ্রন্থসমূহ– উনার কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আল মুসনাদ আল কাবীর (অপ্রকাশিত)।

২. তারিখ ‘উসমান ইবনু সা‘ঈদ আদ্ দারেমী আ’ন ইয়াহ্ঈয়া ইবনু মাঈন (প্রকাশিত)। এই কিতাবের কিছু অংশ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে যেমনটা তাহযিবুত তাহযিব প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট হয়।

৩. কিতাবুর রদ্দু আ’লাল জাহমিয়্যা (প্রকাশিত)। এই কিতাবটি শাইখ বাদরুল বাদর-এর তাহ্ক্বীক্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. রদ্দু আল ইমাম ‘উসমান আদ্ দারেমী আ’লা বিশর আল মুরাইসী আল আ’নিদ (প্রকাশিত)।

এই কিতাবে ইমাম ‘উসমান আদ্ দারেমী (রাহিমাহুল্লা-হ) ফিরকায়ে মুরাইসীয়্যাহ জাহমিয়্যা-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা বিশর ইবনু গিয়াস আল মুরাইসী-এর যুক্তিসঙ্গত ও চমৎকার রদ্দ করেছেন। এই কিতাবের শুরুতে প্রকাশক ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যম (রাহিমাহুল্লা-হ)’র কিতাব ‘আল ইজতে’মা আল জুইউশ আল ইসলামিয়্যাহ’ থেকে নকল করেছেন :

كتابا الدارمي- النقض على بشر المريسي، والرد على الجهمية من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة، مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) يوصي بهما أشد الوصية، ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما.

“দারেমী’র উভয় কিতাবই– আর রদ্দু ‘আলা বিশ্‌র আল মারিসী ও আর রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা, ‘আক্বীদাহ্ বিষয়ে লিখিত চমৎকার ও উপকারী কিতাবসমূহের মধ্য হতে (অনন্য দু’টি কিতাব)। হাদীস ও সুন্নাতের প্রত্যেক তলিবে ‘ইল্‌ম যারা সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আইম্মায়ে দ্বীন এর সাথে ভালোবাসা রাখে, তাদের উচিত এই দু’টি কিতাব অবশ্যই পড়া। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) এই দু’টি কিতাব পড়ার জন্য বিশেষভাবে ওসীয়ত করতেন এবং এই কিতাব দু’টিকে অনেক সম্মান করতেন। এই দু’টি কিতাবে তাওহীদ ও আসমা ওয়াস সিফাতের প্রমাণ আ’ক্বল ও নক্বল (যুক্তি ও বর্ণনা) উভয় দ্বারাই পেশ করেছেন। এই বিশিষ্টতা অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না।[৫৬]

ইমাম আবূ সা’ঈদ আদ্ দারেমী (রাহিমাহুল্লা-হ) ২৮০ হিজরিতে এ নশ্বর দুনিয়াকে চির বিদায় জানিয়ে ওপারে পাড়ি জমান। *[আল্লাহুম্মাগ ফির লাহু ওয়ার হামহু]*

---

[৫৪] *শাযরাতুয যাহাব- ২/১৭৬।*

[৫৫] *ইলাউস সুনান- ১৯/৩৫৮; ক্বাওয়াইদ ফিল উলূমুল হাদীস- পৃ. ৩৫৮।*

[৫৬] *আল ইজতে’মা আল জুইউশ আল ইসলামিয়্যাহ- পৃ. ৯০; ওয়া হামিশ আর রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা- পৃ. ৫।*

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

ঈদ-উল-ফিতরের আমেজ : বহমান থাকুক ঘরে ঘরে

–আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী*

গত ১১ এপ্রিল মহাসমারোহে পালিত হলো ঈদ-উল ফিত্র। মুসলমানদের আনন্দের দিন। দীর্ঘ একমাস সিয়াম পালন করে দোরগোড়ায় ঝংকৃত হলো ঈদের আগমন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নবীর শেখানো তাকবীর “আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ” পাঠ করতে ঈদের মাঠে উপনীত হলেন সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান।

মাসব্যাপী ‘ইবাদতের তাওফীক্ব পেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সেই খুশিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে তাকবীর পাঠ সকল সায়েমের জন্য অপরিহার্য। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে–

﴿وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

“এবং যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও আর আল্লাহ যে তোমাদের পথ দেখিয়েছেন, সে জন্য তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করো ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।”[৫৭]

ইসলাম ধর্মে ঈদের সূচনা হয়েছে দ্বিতীয় হিজরি সনের মাঝামাঝি সময়ে। আনাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় আসেন, তখন দেখেন যে, সেখানের লোকেরা বছরে দু’দিন আনন্দ, উৎসব ও খেলাধূলা করে। দিন দু’টি ‘নওরোজ’ ও ‘মিহিরজান’ নামে প্রতিপালিত হতো। ভিন্ন জাতির এহেন আনন্দঘন দিন দু’টির বিপরীতে ইসলামে দু’দিন আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে বিঘোষিত হয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তোমাদের এ দু’দিনের পরিবর্তে আরও বেশি উত্তম কল্যাণকর দু’টি দিন দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিত্র দ্বিতীয়টি ঈদুল আযহা। এইভাবে সমগ্র দুনিয়াতে উৎসব মুখর পরিবেশে ঈদ পালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে ঈদ উৎসব পালিত হতো। নবম শতক থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সুফি-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকের দল বাংলায় এসেছেন। তাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের আশায় তারা ইসলামের অনুপুঙ্খ নির্দেশনাবলী মেনে চলেছে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের সব ক’টি মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতা হতো। ষোড়শ শতকের চারণ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন : ‘বড়ই দানিশ মন্দি/না জানে কপট ছন্দ/প্রাণ গেলে রোযা নাহি ছাড়ে’। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে, বাংলাদেশেও রোযা পালিত হতো। রোযা শেষে মহাসমারোহে পালিত হতো ঈদ-উল-ফিত্র। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঈদের সালাত অনুষ্ঠিত হতো। শহরাঞ্চলে কিংবা শহর উপকণ্ঠে প্রাচীর বেষ্টিত ঈদগাহ নির্মাণের দৃষ্টান্ত আছে। মুঘল আমলে নির্মিত ধানমণ্ডির ঈদগাহ মাঠ আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অথচ অনেকে ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, বাংলাদেশে ঈদ উৎসব পালনের চল ছিল না। নাস্তিক্য ভাবনাতাড়িত কতিপয় ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক এসব নেতিবাচক তথ্য দিয়ে ইসলামী সমাজে বহমান দীর্ঘ দিনের লালিত চর্চাকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করেছেন।

তদানীন্তন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও তে ছিল ইসলামী চর্চার প্রাণকেন্দ্র। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ধর্মবেত্তাগণ এখানে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বমানের ইসলামী শিক্ষালয়। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গবেষণা ও চর্চার পথিকৃত ছিল এই সোনারগাঁও। শাইখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের অন্যতম। ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর বুৎপত্তি ছিল আকাশছোঁয়া। তিনি সোনারগাঁও ওই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। আবাসিক সুবিধা সংবলিত এই মাদ্রাসাটিতে বহু শিক্ষক ও ছাত্র একই অট্টালিকাপুঞ্জে বসবাস করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আয়েশা বেগমের মতে, এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিদ্যাপীঠ ছিল।[৫৮] অনুরূপভাবে শাইখ আখীসিরাজ, শাইখ আলাউল হক, নূর কুতুব-উল আলম উল্লেখযোগ্য। সোনারগাঁও তদানীন্তন বাংলার সুফি-সাধকদের খানকাহ ধর্মীয় ও

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৫৭] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫ (আংশিক অর্থ)।

[৫৮] আয়েশা বেগম, ‘সোনারগাঁওয়ের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য’, ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি-১৯৯৮, পৃ. ৭।

বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের মহাকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী, জাহাঙ্গীর সিমনানী, নাসির উদ্দিন মানিকপুরী, শেখ হোসেন যুক্কার পোষ, হুসামউদ্দিন মানিকপুরী, শেখ কাকু এ সকল সাধক-দরবেশগণ জ্ঞানচর্চার জন্য বাংলায় উপনীত হন। বিশ্বমানের অন্ততঃ ৫০টির অধিক মাদ্‌রাসা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সেখানে কী না ঈদ উৎসব পালিত হতো না। ‘নারায়ণগঞ্জে কোনো এক এলাকায় ঈদের নামাযের জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে, কিন্তু সালাত পড়ানোর লোক নেই’ –এমনি অবান্তর তথ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষের বিশ্বাসবোধে চিড় ধরাতে পারেন না।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! নতুন করে আর বলার অবকাশ নেই যে, রমাযান ও ঈদ উৎসব পালিত হতো না। সমগ্র বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমানের সিয়াম সাধনা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। সুতরাং তা বাদ দিয়ে কেউ মুসলিম থাকতেই পারেন না। প্রতীয়মান হয় যে, এখনকার মতো তখনও বিপুল সমারোহে ঈদ উৎসব পালিত হতো। আল্লাহ তা‘আলার মহান হুকুম মাসব্যাপী সিয়াম শেষে প্রতিদানের পালা। যে ব্যক্তি সহীহ সুন্নাতকে বুকে ধারণ করে রোযা রাখলো তার প্রতিদান দিবেন আল্লাহ নিজেই। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الصَّوْمَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. "إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَرِحَ".

“সওম আমার জন্য পালন করা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। (কারণ সওম পালনকারী স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়না ও আহার-বিহার শুধু আমার জন্যই পরিহার করে।) রোযাদারের তাৎক্ষণিক অর্থাৎ- দিবাবসানের পর এক আনন্দ ইফতার। আর এক আনন্দ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের অপূর্ব সুযোগ।”[৫৯]

এমনি একটি ব্রত পালন শেষে আসে ঈদ-উল ফিত্‌রের সালাত। সালাত শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর ন্যায়। অর্থাৎ- সিয়াম সাধনার অনিবার্য ফল হলো নিষ্পাপ হওয়া যা মানুষের চির কামনা। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! উল্লিখিত ‘ইবাদতের অনিবার্য ফল যেমন ইফতারের আনন্দ তেমনি মহান আল্লাহর দীদার। উপরোক্ত পালিত হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বড় হুকুম ‘ইবাদত করা। যার মধ্যে লুক্কায়িত আছে এতায়াত বা অনুসরণের বাধভাঙ্গা প্রবণতা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘ইবাদতের জন্যই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

“আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন্‌ এবং মানুষকে এ জন্যই যে, তারা কেবল আমার ‘ইবাদত করবে।”[৬০]

‘ইবাদতের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সিয়াম সাধনা। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজ। সিয়ামব্রত পালন করা। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার ফলে অর্জিত হয় তাক্বওয়া। কুরআনুল কারীমে উক্ত আছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর (রমাযান মাসে) সিয়াম ফর্‌য করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্বসূরীদের উপর ফর্‌য করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারে।”[৬১]

আয়াতে কারীমার অনুকরণে তাক্বওয়া হলো আল্লাহভীরুতা। তাক্বওয়ার শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। তাক্বওয়াবান মানুষ পরিচিতি লাভ করে মুত্তাকী হিসেবে।

পবিত্র মাহে রমাযানের এটি আরো একটি অসাধারণ অর্জন। এটি সত্যিকারার্থে অর্জিত হলে আল্লাহভীতি ক্রিয়াশীল হয়। যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। নিজেকে পরিচালনা করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে। ফলশ্রুতিতে মুত্তাকীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ○ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করবে ও কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে তার স্থান হবে জান্নাত।”[৬২]

তাক্বওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনে তাক্বওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাক্বওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা

---

[৫৯] সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৫/১১৫১।

[৬০] সূরা আয্‌ যা-রিয়া-ত : ৫৬।

[৬১] সূরা আল বাক্বারাহ্‌ : ১৮৩।

[৬২] সূরা আন্‌ না-যি‘আ-ত : ৪০-৪১।

দান করে। ইসলামী জীবনদর্শনের পরিসীমায় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ। তাক্বওয়ার গুরুত্ব প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায় পবিত্র কুরআনুল কারীমে।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়াবান।”[৬৩]

আল্লাহর নিকট তাক্বওয়ার মূল্য অত্যাধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলে মানুষ আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান হতে পারে না; বরং যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।”[৬৪]

পার্থিব জীবনে মুত্তাকীগণ আল্লাহ তা‘আলার বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন। তিনি তাক্বওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। বরকতময় রিয্ক দান করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

“যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাঁর পথ করে দেবেন এবং তাঁকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিয্ক দান করবেন।”[৬৫] পরকালেও তাক্বওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ তা‘আলা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকীদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। কুরআনে উল্লিখিত আছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

“মু’মিনগণ! যদি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।”[৬৬] খালেক রাব্বে কারীম মানুষকে বড় ভালোবাসেন। ক্ষমার ভাণ্ডার অবারিত করে ঘোষণা দেন–

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا﴾

“নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীগণের জন্য রয়েছে সফলতা।”[৬৭] প্রকৃত প্রস্তাবে তাক্বওয়া হতে পারে মানব চরিত্রের অমূল্য ভূষণ। হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে সীমাহীন সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা।

নৈতিকজীবন মনুষ্যত্বের আঁধার। মার্জিত জীবনাচারে নৈতিকতা অনস্বীকার্য। এটি ছাড়া মানুষ নামক প্রাণিটি মনুষ্যত্ব দাবি করতে পারে না। সে কারণে নৈতিক জীবন গঠনে ও নৈতিকতা রক্ষায় তাক্বওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাক্বওয়া সকল সৎ গুণরাজির উৎস মূল। ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি হলো তাক্বওয়া। তাক্বওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীতে উদ্বুদ্ধ করে। হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা মহান আল্লাহকে স্মরণ করেন। শয়নে, স্বপনে বিস্মৃতি হন না তাঁর খালেককে। আল্লাহ তা‘আলা ‘সামিয়ুন বাশির’। তিনি সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন মুত্তাকীরা এ বিশ্বাস গভীরভাবে পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন আল্লাহ তা‘আলা দেখেন ও জানেন। তাক্বওয়াবান ব্যক্তি নিজ জীবনাচারে কিংবা তার নিয়ন্ত্রিত পরিসরে কঠোরভাবে তা মেনে চলবেন নীতি-নৈতিকতা। অনৈতিক ও অশ্লীলতা পরিহার করবেন।

তাক্বওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণীত করে। সুতরাং আমরা আমাদের পবিত্র মাহে রমাযানের এ অর্জনকে হারাতে চাই না। প্রতি পলে আমরা নজর রাখবো যাতে পদস্খলন না ঘটে। চির দুশমন মানুষ ও জিন্-শয়তানের ওয়াসওয়াসায় যাতে না পড়ি। তাহলেই বিরাজিত থাকবে আনন্দ আমেজের ফল্গুধারা। জমজমাট হবে ইহজৈবনিক নাটকের রঙ্গমেলা। ❑

---

[৬৩] সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।

[৬৪] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪।

[৬৫] সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩।

[৬৬] সূরা আল আনফাল : ২৯।

[৬৭] সূরা আন্ নাবা- : ৩১।

সূচীপত্র

ক্বাসাসুল কুরআন

যে নারীর আর্তনাদে ওহী নাযিল হয়

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূল (ﷺ)-এর একজন সম্মানিত মহিলা সাহাবী যার ফরিয়াদ স্বয়ং আল্লাহ শ্রবণ করেছিলেন এবং তার উত্তরে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলা সাহাবী হলেন খাওলা বিনতু সালাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে বলেন :

﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ٭ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

“আল্লাহ অবশ্যই ঐ স্ত্রী লোকটির কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করছিল, আর আল্লাহর দরবারেও অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে যিহার করে (তারা জেনে রাখুক), তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন। তারা তো একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলছে। আর আল্লাহ তো অতীব গুনাহ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল। আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, পরে তারা প্রত্যাহার করতে চায় যা তারা বলেছে, তাদের দায়িত্ব একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়া। এ আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে নসীহত করা যাচ্ছে। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। তবে যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দু’মাস রোযা রাখবে। আর যে ব্যক্তি এতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এ নির্দেশ এজন্য যে, তোমরা যেন ঈমান আনয়ন করো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[৬৮]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুওয়াইলাহ (খাওলা) বিনতু সালাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমার ও (আমার স্বামী) আউস ইবনু সামিতের ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আল মুজাদালার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, আমার বৃদ্ধ স্বামী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও ক্রোধবশে আমার সাথে ‘যিহার’ করেন। তখন আমি প্রতিবেশী এক মহিলার কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করি এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করি। তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘হে খুওয়াইলাহ! তোমার বৃদ্ধ চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো’। কিন্তু আমি অভিযোগ পেশ করতেই থাকি। খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ঐভাবেই বসে রইলাম। যতক্ষণ না আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেহুঁশের মতো হয়ে গেলেন যেমনটি ওহী নাযিলের সময় হয়ে থাকে। অতঃপর সেটি কেটে গেল। তখন তিনি বললেন, ‘হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সূরা আল মুজাদালাহ্’র ১-৪ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বলেন, তুমি তোমার স্বামীকে গিয়ে বলো, সে যেন একটি দাস মুক্ত করে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! তার এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সে একটি দাস মুক্ত করবে। তিনি বললেন, তাহলে সে একটানা দু’মাস সিয়াম রাখুক। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সে অতি বৃদ্ধ মানুষ। তার সিয়াম রাখার ক্ষমতা নেই। তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীন খাওয়াক। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! তার সে ক্ষমতা নেই। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, আমরা তাকে এক ‘আরাক্ব (১৫ সা‘) খাদ্য সাহায্য দিব। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে আর এক ‘আরাক্ব দিয়ে সাহায্য করব। একথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি সঠিক বলেছ ও সুন্দর কথা বলেছ। তুমি যাও এবং তার পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ করো। আর তোমার চাচাতো ভাইকে উত্তম উপদেশ দাও। খাওলা বলেন, অতঃপর আমি সেটা করলাম।[৬৯]

[১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

---

[৬৮] *সূরা আল মুজাদালাহ্ : ১-৪।*

[৬৯] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৪২৭৯।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

হজ্জ : কিছু কমন (Common) ত্রুটি-বিচ্যুতি

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : হাজ্জব্রত পালনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছুটে যায় আরবের মুরুপ্রান্তর মক্কা অভিমুখে। বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ হজ্জের কার্যবলী সম্পাদনের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই এ সফরের একমাত্র লক্ষ্য; আর আছে জান্নাত লাভের তীব্র বাসনা। এজন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নির্ভুল হজ্জ সম্পাদন অত্যন্ত জরুরি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

«الحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

অর্থাৎ- কবুল হজ্জের বিনিময় হলো জান্নাত।[৭০]

কিন্তু আমাদের ক’জনের হজ্জ সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পাদন হচ্ছে। এরপরও আমরা সম্ভব্য চেষ্টা করি, মাকবুল-মাবরুর হজ্জ সম্পাদনের। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের অজানা ও অসচেতনতার কারণে কমন কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাবরূর হজ্জের পথে অন্তরায়। অতএব সতর্ক হওয়া জরুরি, যেন আমরা যথাযথ হাজ্জ সম্পন্ন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই। সম্মানিত যাইফুর রহমানগণের খিদমতে নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করা হলো–

ক. মীকাত ও ইহরাম সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি :

১. হাজ্জ কিংবা ‘উমরার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও ইহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করা।

২. ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর থেকে ইযতিবা করা ও তাওয়াফ শেষে ইযতিবা অবস্থাতেই দু’রাকআত সালাত আদায় করা। ইযতিবা অর্থ চাদরের দু’প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর রেখে দিয়ে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। ইযতিবা করাতে হয় তাওয়াফ করার সময়।

৩. ‘উমরার নিয়তের সময় لبيك عمرة ও হজ্জের নিয়তের لبيك حجا বলা ছাড়া অন্য কোনো শব্দে নিয়ত পাঠ করা।

খ. তালবিয়া পাঠ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি : অনেকে দলবদ্ধভাবে একই স্বরে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। পূর্বে একজন বলেন পরে সবাই সমস্বরে বলেন। এরূপ করা ভুল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাগণ এভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তেন। তবে যদি কেউ না জানে শিক্ষার জন্য অন্যের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। গুরুত্ব দিয়ে তালবিয়া মুখস্থ করতে হবে ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে।

গ. হারামে প্রবেশের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. পবিত্র হারামে প্রবেশের সময় অনেক হাজী এমন কিছু দু‘আ পাঠ করে থাকেন যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। অথচ সংগত হলো মাসনূন দু‘আ পাঠ করা।

২. মসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ জরুরি মনে করা; বরং যে কোনো দরজা দিয়েই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা সঙ্গত।

ঘ. তাওয়াফের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট করা ও তা পড়া।

২. তাওয়াফের সময় একজন নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চস্বরে দু‘আ পড়া ও অন্যরা সমস্বরে তার অনুকরণ করা।

৩. অনেকেই মনে করেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন না করলে হাজ্জ শুদ্ধ হবে না, এ ধারণা ঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন-স্পর্শ করা সুন্নত। পক্ষান্তরে সম্ভব না হলে কেবল ইশারা করাই সুন্নত।

৪. কেউ কেউ রুকনে ইয়ামেনিকে চুম্বন করে থাকে। এটা ঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ডান হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামেনিকে স্পর্শ করা ও স্পর্শের পর হাতে চুম্বন না করা। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে হাতে ইশারা করার কোনো বিধান নেই।

৫. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ কা‘বার দেয়াল স্পর্শ করেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনি ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করেননি। তাই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৭৭৩।*

৬. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ হাতীমের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। এরূপ করলে তাওয়াফ হবে না। কেননা হাতীম পবিত্র কা'বার অংশ হিসেবে বিবেচিত।

৭. অনেকেই তাওয়াফের সময় সাত চক্করেই রামল করেন, এরূপ করা উচিত নয়। নিয়ম হলো, কেবল প্রথম তিন চক্করে রামল করা, আর বাকি চক্করগুলোতে স্বাভাবিকভাবে চলা। উল্লেখ্য যে, রামল অর্থ দ্রুত চলা।

৮. তাওয়াফের সময় অনেকেই মাকামে ইব্‌রা-হীমকে হাত অথবা রুমাল-টুপি দিয়ে স্পর্শ করে থাকে, এরূপ করা মারাত্মক ভুল।

৯. বিদায়ী তাওয়াফের পর পবিত্র কা'বার সম্মানার্থে উল্টো হেঁটে বের হওয়া সংগত নয়; বরং সাভাবিকভাবেই ফিরে আসতে হবে।

১০. অনেকের ধারণা—মাকামে ইব্‌রা-হীমের পিছনে ছাড়া মসজিদের অন্য কোথাও তাওয়াফের দু'রাকআত সালাত আদায় করা যাবে না। এ ধারণাও সঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে মাকামে ইব্‌রা-হীমে সালাত আদায় করবে সম্ভব না হলে হারামের যে কোনো স্থানে পড়ে নিবে।

সা'ঈ করার সময় ভুল-ত্রুটি :

১. সা'ঈর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়া; বরং মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

২. মারওয়া পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করা; বরং সাফা পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করতে হবে।

৩. সাফা পাহাড়ে উঠে সালাতের তাকবিরের ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে ইশারা করা। শুদ্ধ হলো দু'হাত তুলে শুধু দু'আ করা।

৪. কেউ কেউ মনে করেন, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে সা'ঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়। এ ধারণা ভুল; বরং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলেই এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৫. সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সা'ঈ করার পুরো সময়টাতে দ্রুত চলা ভুল। সা'ঈর সময় কেবল সবুজ দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলতে হবে।

৬. কেউ কেউ সা'ঈ করার সময়ও ইযতিবা করে থাকে। এটা ভুল। ইযতিবা কেবল তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়।

৭. পুরুষদের জন্য সবুজ চিহ্নের মাঝে সাঈ' তথা দৌড়ে না চলা; বরং দৌড়ে চলতে হবে।

৮. সা'ঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা দু'আ পাঠ করা; বরং প্রতি চক্কর শেষেই চাহিদামত দু'আ করবে।

ঙ. হলক কিংবা কসরের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক 'উমরাহ্ আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ করে থাকে যা সুন্নাতের খিলাফ ও ভুল। কারণ একটি সফরে একাধিক 'উমরাহ্ করা ঠিক নয়।

২. সা'ঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে হলক-কসর করা। অথচ নিয়ম হলো ইহরামের কাপড় গায়ে থাকা অবস্থায় হলক-কসর করা।

চ. ৮ যিলহাজ্জ-এ ভুল-ত্রুটি :

১. ৮ তারিখে মিনাতে না এসে সরাসরি আরাফায় চলে যাওয়া।

২. পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ না করা।

৩. মিনাতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মিনার বাইরে অবস্থান করা।

ছ. আরাফা দিবসের ভুল-ত্রুটি :

১. আরাফার সীমানায় প্রবেশ না করেই উকুফ করা এবং সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

২. আরাফা মনে করে মসজিদে নামিরার সম্মুখভাগে উকুফ করা। অথচ এ অংশটি আরাফার সীমানার বাইরে।

৩. জাবালে আরাফাকে জাবালে রহমত বলা তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় মনে করা এবং সেখান থেকে বরকতের আশায় পাথর সংগ্রহ করা।

৪. কিবলাকে পিছনে রেখে জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দু'আ করা।

৫. সূর্যাস্তের পূর্বেই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফাহ্ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

জ. উকুফে মুযদালিফার ভুল-ত্রুটি :

১. ধীর-স্থির ও শান্ত ভাব বজায় না রেখে হুলস্থুল করে মুযদালিফার পথে রওয়ানা হওয়া।

২. মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে পথেই মাগরিব-'ইশা আদায় করে নেয়া।

৩. সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকারের মাধ্যমে মুযদালিফায় রাত্রি-যাপন করা।

৪. মুযদালিফায় উকুফ না করে তা অতিক্রম করে মিনায় চলে যাওয়া।

৫. সূর্যোদয় কিংবা তারও পর পর্যন্ত মুযদালিফার উকুফকে প্রলম্বিত করা। কেননা রাসূল (ﷺ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

ঝ. কঙ্কর নিক্ষেপের ভুল-ত্রুটি : মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়িয়ে না নিলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা। জামরাতে শয়তান রয়েছে মনে করে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় উত্তেজিত হয়ে নিক্ষেপ করা। স্তম্ভের গায়ে কঙ্কর না লাগলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা; বরং হাউজের মধ্যে যেকোনো জায়গায় পড়লেই কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে। মুস্তাহাব মনে করে কঙ্কর ধুয়ে পরিষ্কার করা। নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিড়ের ভয়ে অন্যকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো। ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে কঙ্কর মারা। প্রতি জামারাতে ৭টির বেশি কঙ্কর মারা এবং প্রতিদিন দুই কিংবা তিনবার করে কঙ্কর মারা। প্রথম ও মধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দু'আ করার জন্য না দাঁড়ানো। ৭টি কঙ্কর একবার মুষ্টিবদ্ধ করে নিক্ষেপ করা।

অন্যান্য ভুল-ত্রুটি : আইয়ামে তাশরীকে মিনায় অবস্থান না করা।

১. হারাম সীমানার বাইরে 'হাদী' জবেহ করা। কুরবানির জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই না করে কুরবানি করা।

২. কুরবানি করার পর নিজে না খেয়ে এবং ফকির-মিসকিনকে না দিয়ে ফেলে দেয়া। ঈদের দিনের আগে কুরবানি করা।

৩. কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ শেষ করার পূর্বেই বিদায়ি তাওয়াফ সম্পন্ন করা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করে সরাসরি নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া। বিদায়ি তাওয়াফের পর যাত্রার ব্যস্ততা ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা। বিদায়ি তাওয়াফের পর কাবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানো। কিংবা কা'বাকে সামনে রেখে উল্টো হেঁটে মসজিদ থেকে বের হওয়া।

মাদীনাহ্ মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুল-ত্রুটি :

১. মদীনা যিয়ারত হজ্জের অংশ বলে মনে করা।

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

৩. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর কাছে দু'আ করা। কোনো কিছুর জন্য দু'আ কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে।

৪. মসজিদে নব্বীর ভিতর রাসূল (ﷺ)-এর মিহরাব ও 'উসমানী মিহরাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করা ও একে বরকতময় মনে করা।

৫. মসজিদে নব্বীর দেয়াল, রাসূল (ﷺ)-এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা।

৬. উহূদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং বরকত লাভের আশায় ছেঁড়া কাপড় বা নেকরা বাঁধা এবং সেখানে এমন-সব কাজ করা যাতে মহান আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি নেই।

৭. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূল (ﷺ)-এর নিদর্শন। যেমন- উষ্ট্রীর বসার স্থান, আংটি কূপ [যে কূপে রাসূল (ﷺ)-এর আংটি পড়ে গিয়েছিল] অথবা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কূপ। অথবা বরকত লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা।

৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দু'আ পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতে থাকা যে, এ স্থান দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান। মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাকআত সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা। বাকি কবরস্থান ও উহূদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় যেখানে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

সাত মসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফযীলত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মসজিদে দু'রাকআত করে সালাত আদায় করা। মাদীনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মাদীনায় জুতা পরিধান করা উচিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল হাজীদের নির্ভুলভাবে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। *[গ্রন্থনায়– আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান]*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা

–সাইফুল্লাহ ত্রিশালী

[১ম পর্ব]

বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মানজনক পেশা শিক্ষকতা। শিক্ষকগণ আছে বলেই সভ্য পৃথিবী এখনও বেঁচে আছে। আধুনিকতা দিন দিন পরিশীলিত হচ্ছে শিক্ষকদের হাত ধরেই। প্রতিনিয়ত সুশিক্ষার ফলে আমরা নতুনের স্বাদ পাচ্ছি। অসভ্যতা, কুসংস্কার আর হিংস্রতা দূর করার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন। এ মর্মে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[৭১] মূর্খতা আর অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন তিনি।

শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা অন্য সমস্ত পেশাকে সৃষ্টি করে। মনে রাখা জরুরি- একটা বই, একটা কলম, একটা বাচ্চা এবং একটা শিক্ষক সারা বিশ্বের ছবিটাই বদলে দিতে পারে। A great teacher is a candle it consumes itself to light the way for others. “একজন ভালো শিক্ষক মোমবাতির মতো, যিনি নিজে পুড়ে অন্যের পথ আলোকিত করেন।”

ইসলামে শিক্ষকের মর্যাদা

পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাসংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

“পড়ো! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়ো! আর তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।”[৭২]

নবী করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা জ্ঞানার্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব শিষ্টাচার শিখো। যার কাছ থেকে তোমরা জ্ঞানার্জন করো, তাকে সম্মান করো।[৭৩]

ইসলামী সমাজে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং ইসলাম শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “হে মু’মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সঙ্গে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না। কেননা এতে তোমাদের ‘আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।”[৭৪]

যারা জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করেছে সমাজের প্রতি তাদের অবদান, অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সবচেয়ে বড় দানশীল আল্লাহ। তারপর আদম সন্তানের মধ্যে আমি হলাম সবচেয়ে দানশীল। এরপর বেশি দানশীল ওই ব্যক্তি, যে জ্ঞানার্জনের পর তা প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন একাই একজন আমীরের মতো বা এক উম্মত হিসেবে মর্যাদাসহ উপস্থিত হবে।’[৭৫]

একজন শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীদের জন্য দু‘আ করেন তেমন শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকের জন্য দু‘আ করবে : এ ক্ষেত্রে নবী কারীম (ﷺ)-এর আরেকটি বাণী প্রণিধান যোগ্য। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, কেউ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তোমরা তাকে এর বিনিময় প্রদান করবে। যদি বিনিময় দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া পর্যন্ত দু‘আ করতে থাকবে যে তোমরা তার সমপরিমাণ বিনিময় প্রদান করতে সক্ষম হয়েছো।[৭৬] একজন আদর্শ শিক্ষকই শুধু আদর্শ সমাজ গড়তে পারেন। জ্ঞানই মানুষকে যথার্থ শক্তি ও মুক্তির পথনির্দেশ দিতে পারে। নবী কারীম (ﷺ) বলেন, ‘দুই ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কারও পদ-গৌরব, লোভনীয় নয়। তা হলো– ১. ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা‘আলা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ২. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা‘আলা বিদ্যা দান করেছেন এবং সে অনুসারে কাজ করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।[৭৭] পৃথিবীতে অনন্তকাল থেকেই শিক্ষকের মর্যাদা ছিল, আছে এবং থাকবে। **১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম**

---

[৭১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৫।*

[৭২] *সূরা আল ‘আলাক্ব : ১-৫।*

[৭৩] *আল মুজামুল আওসাত- হা. ৬১৮৪।*

[৭৪] *সূরা আল হুজুরা-ত : ২।*

[৭৫] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫৯।*

[৭৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬৭২।*

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১।*

অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইউনেস্কো মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক এম মেয়রের যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সূচনা করা হয়। এরপর ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১০০টি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। এটি দেশ-বিদেশে 'শিক্ষক' পেশাজীবীদের জন্য বিশেষ সম্মান। শিক্ষকদের অবদান স্মরণ করার জন্য দিবসটি পালন করা হয়। মূলত ইসলাম মানুষকে জ্ঞানের পথে চলতে বলে, জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করে। **জাহেলি আরবে শিক্ষিত লোক ছিল মাত্র ১৭ জন।** তৎকালীন সমাজ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"[৭৮]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"[৭৯]

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল ব্যাপক : আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, 'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব শিষ্টাচার শিখো। তাকে সম্মান করো যার থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো।' **সুতরাং যার থেকে জ্ঞান অর্জন করা হয় তিনিই আমাদের শিক্ষক।** একবার যায়েদ ইবনু সাবিত তার সওয়ারিতে পা রাখার জন্য রেকাবে পা রাখলেন। তখন ইবনু 'আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) রেকাবটি শক্ত করে ধরেন। জায়েদ ইবনু সাবিত বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি (রেকাব থেকে) হাত সরান।' উত্তরে ইবনু 'আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, 'না'. আলেম ও বড়দের সঙ্গে এমন সম্মানসূচক আচরণই করতে হয়।

আধুনিক সময়ে নতুন প্রজন্মের কাছে শিক্ষকের মর্যাদা : "কবি কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষকের মর্যাদা' কবিতাটি আজকাল শিক্ষকের সম্মানের বিষয়ে এখন রূপকথামাত্র। আগে বলা হতো শিক্ষক সেবিলে উন্নতি হয়, আর এখন শিক্ষক ছেঁচিলে উন্নতি হয়। হামেশাই শিক্ষকরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। বাদশাহ আলমগীরের ছেলে শিক্ষকের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন, এখন পুরো গা ধুয়ে দিচ্ছে। পাঁজাকোলো করে পুকুরে ফেলে দিচ্ছে।" কথাগুলো বলছিলেন, লেখক কলামিষ্ট মো. জাকির হোসেন। অনেকটা মনের ক্ষোভ উগরে দেওয়ার মতো। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ শ্রদ্ধার কথা বলতে যেয়ে অধ্যাপক আবুল ফজল লিখেছেন ৬৯-এর নভেম্বর মাসে ইত্তেফাক পত্রিকায়। 'শক্ত কেন্দ্র কেন ও কার জন্য' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধু অভিনন্দন জানিয়ে তাকে পত্র লিখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পত্রের জবাবে অধ্যাপক আবুল ফজল যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তরে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন আপনার মতো জ্ঞানী, গুণী ও দেশপ্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুবই আনন্দিত হতাম। আবার যখন চট্টগ্রামে যাবো, সাহিত্য নিকেতনে যেয়ে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করবো। অধ্যাপক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফোন করে বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক আবুল ফজলের অনুমতি নিয়েছিলেন বলে আবুল ফজল তার লেখায় উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই বঙ্গবন্ধুরই যোগ্য উত্তরসুরী দেশনেত্রী শেখ হাসিনা। তবে কেন শিক্ষকের মর্যাদার একাল সেকাল এতো তফাৎ। এখন শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে। প্রণোদনা বেড়েছে। পদমর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বহুগুণ। কিন্তু কেন? বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশন এন্ড শিক্ষক এসোশিয়েশন এর বিভিন্ন সেমিনার এবং উন্মুক্ত আলোচনা থেকে অনেক সমস্যাই চিহ্নিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. সমাজের সর্বোচ্চ মহল থেকে শিক্ষকের মর্যাদা হানি হয়েছে : শিক্ষক ও শিক্ষকতার প্রতি আঘাতের ঘটনায় এ সমাজ কখনো চুপ থাকেনি। কেন একজন সংসদ-সদস্যের হাতে রাজশাহী অঞ্চলের একটি কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম রেজাকে মার খেতে হবে? সাভারের আশুলিয়ায় হাজী ইউনুস আলী স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক উৎপল কুমার সরকারকে কেন তারই শিক্ষার্থীর হাতে মরতে হবে? নড়াইলের সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসকে কেন গলায় জুতার মালা পরতে হবে? মুন্সীগঞ্জের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মন্ডলের বিজ্ঞান ক্লাসে ধর্ম নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝির জেরে শিক্ষককে কেন জেলে যেতে হবে? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক বেগম আসমা সিদ্দীকাকে কেন ক্লাসে হেনস্তা হতে হবে? কেন প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষককে দপ্তরির হাতে মার খেতে

---

[৭৮] *সূরা আয্ যুমার : ৯।*

[৭৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৯।*

সূচীপত্র

হবে? কদিন আগেও দেখেছি, পরীক্ষার হলে এক বেয়াদব ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে চড় মারার মতো নির্লজ্জ ঘটনা। প্রতিনিয়ত ঘটছে এমনটি। তাই সমাজের কর্তাব্যক্তিদের বোধগম্য না হলে এ সমস্যা চলমান থাকবে। দু-একজন অপরাধীকে শাস্তি দিলেও যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এমনটি নয়, সার্বিকভাবে সামাজিক পরিবর্তন দরকার। শিক্ষক সমাজকে অপমান ও হেনস্তাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা আজ বড়ই প্রয়োজন। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে প্রসাশন এমনকি রাষ্ট্র দায়ী থাকবে।

২. বাদশাহ আলমগীর কিম্বা আব্রহাম লিংকনের মতো শাসকের অভাব আছে বলেই শিক্ষক নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না : দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ মনে করেন, বাদশাহ আলমগীরের মতো মহান উদার শাসক দরকার। আব্রাহাম লিংকনের মতো তেজস্বী, সত্যের মূর্তপ্রতিক এবং অন্যায়ের সাথে আপোষহীন রাষ্ট্রনায়ক প্রয়োজন। তবেই যদি শিক্ষকের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে...। সাহসী শিক্ষকও দরকার। যে কিনা জালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রহুঙ্কার দিতে পারবে। “শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার-দিল্লীর পতি সে সেতো কোনো ছার, ভয় করি না’ক- ধারি না’ক ধার, মনে আছে মোর বল, বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাবো অনর্গল।” প্রধান শিক্ষকের কাছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের চিঠির কথা আমরা কে না জানি। সেই চিঠির মাধ্যমে তিনি পরিচয় দিয়েছেন একজন সৎ বাবার, একজন সৎ রাষ্ট্রনায়কের। সমুন্নত করেছেন শিক্ষকের মর্যাদাকে সবার উপরে। তিনি পৃথিবীর সব রাষ্ট্রনায়কদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন– একজন শিক্ষক বাদশাহর চেয়েও মর্যাদাবান। সুন্দরহাতের সুন্দর লেখনীতে কিছু অমীয় বাণী আজও আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয়। চলুন না এক ঝটকায় আরেকবার পড়ে নিই। **মাননীয় মহাশয়,**

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন– সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর লুকায়িত থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন প্রত্যেক শত্রুর মাঝে একজন বন্ধু থাকে। আমি জানি এটা শিখতে তার সময় লাগবে, তবুও যদি পারেন তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাবার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন কিভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কিভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দিবেন। যদি পারেন হাসির গোপন সৌন্দর্য্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগে-ভাগেই একথা বুঝতে শেখে-যারা পীড়নকারী তাদেরকেই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তা-ও তাকে বুঝতে শেখাবেন।

আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। নিজের উপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে।

তাকে শেখাবেন, ভদ্র লোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায় যেন হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। সে যেন সবার কথা শুনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন ভালোটাই শুধু গ্রহণ করে– এ শিক্ষাও তাকে দেবেন। সে যেন শেখে দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয় আবার কান্নার মাঝে যে লজ্জা নেই এ কথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদেরকে সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম আয়েশ থেকে যেন সাবধান থাকে।

আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না। কেননা আগুনে পুড়ে ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহস হওয়ার ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষাও দেবেন নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

মুসলিম ঈমানদার ন্যায় পরায়ণ শাসক সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল বা শাসক তাদের আনুগত্য করো।”[৮০]

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন মহান আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীর বা শাসকের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বা শাসক হলেন ঢালস্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা নিরাপদে থাকা যায়।

---

[৮০] *সূরা আন্ নিসা : ৫৯।*

সুতরাং যে শাসক মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ভীতি রেখে তার বিধান মোতাবেক শাসন চালায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে এর বিনিময়ে সে প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি সে মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কোনো কাজ করে তাহলে তার গুনাহ ও সাজা তার উপর বর্তাবে।[৮১]

৩. অভিভাবকদের খামখেয়ালি : অনেক বাবা-মা সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা বা অধিক আস্থাশীল হয়ে পড়েন। আস্থাশীল কেমন? মানে তার সন্তান কোনো অন্যায় করতেই পারে না, এমন অন্ধ বিশ্বাস থাকা। প্রতিবেশীর বাচ্চার সাথে ঝগড়া করলেও সন্তানকে শাসন না করে ছাড় দেয়া। বাচ্চার সব খামখেয়ালি মেনে নেয়া। চাহিদা প্রকাশ করার আগেই প্রয়োজনের অধিক খরচ করার মানসিকতা। অথচ পবিত্র কুরআনে এদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।[৮২] কালের ইতিহাসে দেখা গেছে এরকম অভিভাবকরাই শেষ বয়সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। কারও ঠাঁয় হয় বৃদ্ধাশ্রমে। সমাজের সচেতন মহল মনে করেন, ছেলে-মেয়ে বখাটে হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন- **ক.** শিশু বয়সে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা না দেয়া। **খ.** সন্তানকে সব ব্যাপারে বেশি স্বাধীনতা দেয়া। **গ.** একই অপরাধ বার বার করার পরও শাসন না করা। **ঘ.** সন্তানের প্রতি খেয়াল না করা (বাসার বাইরে সে কোথায় যায়, কার সাথে মেশে, একাকীত্ববোধ করে কিনা, ঘরের দরজা দীর্ঘ সময় বন্ধ করে রাখে কী না, স্কুল থেকে সময়মতো বাসায় ফিরে কিনা, মুখ থেকে কোনো দুর্গন্ধ আসে কিনা ইত্যাদি)। **ঙ.** প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দেয়া। **চ.** মোবাইল কিংবা কোনো ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হওয়া। **ছ.** কোনো কোনো বাবা-মা উভয়েই চাকুরীজীবি হওয়ার কারণে সন্তানকে সময় না দেয়া ইত্যাদি।

৪. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দুরাবস্থা : সরকার পুরোনো শিক্ষা কার্যক্রম পাল্টে নতুন শিক্ষা ক্যারিকুলাম চালু করেছে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা অবকাঠামো মজবুত করবে, ছেলে-মেয়েরা প্রাণবন্ত শিক্ষা পাবে এমনটিই ধারণা ছিল বিজ্ঞজনদের। দেখতে দেখতে নতুন শিক্ষাক্রম এক বছর পার করল। অবশ্য ২০২২ সালে শুধু ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৬২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) চালানো হয়। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ৫১টি, ৯টি মাদ্‌রাসা ও ২টি কারিগরি বিদ্যালয়। এরপর ২০২৩ সালে সারা দেশে এ শিক্ষাক্রম চালু করা হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে। শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা। অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন, এই শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা না থাকায় শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে বসছে না। ফলে তাদের পড়াশুনা হচ্ছে না। তাঁরা আরও বলেন, এতে দলগত কাজ বেশি। ফলে দলের প্রধান বাধ্য হয়ে কাজ করে, অন্য শিক্ষার্থীরা কিছু করে না। আবার এসাইনমেন্ট তৈরি করতে গিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের জন্য অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। আর স্কুল থেকে এমন সব উপকরণ দিয়ে এমন সব জিনিস বানাতে দেয়, যা জোগাড় করে বানানো কষ্টকর হয়ে যায়। অভিযোগ উঠে, শিক্ষার্থীরা ডিভাইসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ, শিক্ষকেরা এমন সব কাজ দিচ্ছেন, যা করার জন্য মুঠোফোন দেখতে হয়।

এরপর স্কুলে রান্না করা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। প্রশ্ন উঠে, ডিম ভাজি করা আর আলুভর্তা করা শেখাতে স্কুলে পাঠাতে হবে কেন? কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিক মনজুর। তিনি আরও বলছিলেন, 'একেকটি পাঠ্যপুস্তকে লেখক-সম্পাদক হিসেবে ১০-১২ জনের নাম থাকে। অথচ এরপরও বইয়ে নানা অসংগতি ও ভুল থেকে যাচ্ছে। এর মানে, তাঁরা যথেষ্ট সময় নিয়ে একসঙ্গে বসে পুরো বই দেখছেন না।' স্কুলে পড়াশুনার চাপ নেই ভেবে অনেক উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়ে বাজে আড্ডা আর নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের অনেকেই তাচ্ছিল্যের সাথে এ বিষয় নিয়ে উপহাস করছে। তারা বলছে, যে সময় আমরা স্কুলে গিয়ে আলুভর্তা বানানো শিখছি সে সময় বাইরের দেশের স্কুলে রকেট, বিমান আর রোবোট বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এতদিন আমরা জেনে আসছি মানুষের জন্ম হয়েছে আদম (আলায়হিস সালাম) থেকে। এখন বইয়ে দেখছি বানর থেকে। তাহলে কি আমদের পূর্বপুরুষরা সত্যিই বানর ছিল। সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে এ ভুলের সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম শাসকদের হেয় করার বিষয়টি। এসবের পাশাপাশি অনেকেই বিভিন্ন বইয়ের নানা অসংগতি ও ভুল ধরিয়ে দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে এসে এনসিটিবি বাধ্য হয় সমাজ বই তুলে নিতে। বিজ্ঞান বইয়ের লেখক-সম্পাদকেরা লিখিত বিবৃতি দিয়ে তাঁদের ভুল স্বীকার করেন। এরপর এনসিটিবি উদ্যোগ নেয়। শেষে বইয়ের লেখক-সম্পাদকদের একসঙ্গে বসিয়ে ভুলের তালিকা করে সেগুলো স্কুলে পাঠায়। ☐

---

[৮১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[৮২] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ২৬।*

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

মহিলা জগত

বিশ্বের মুসলিম রমনীদের আদর্শের প্রতীক “ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)”

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী তথা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিলেন ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)। মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। বেশ কিছু বিষয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাঁর সাদৃশ্য ছিল। বিশেষ করে তাঁর চলার ধরণ ছিল হুবহু রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতোই। এ জন্য তিনি একজন অসাধারণ গুনের অধিকারী ছিলেন। যে কারণে অন্য মহিলাদের থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারো সাথে তুলনীয় ছিলেন না। বিধায় তিনি বিশ্বের সকল মুসলিম রমনীদের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্রী। তিনি ছিলেন একজন পিতার স্নেহধন্য কন্যা, মাতাময়ী মা, দায়িত্বশীল স্ত্রী, একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সর্বোপরি নারীদের জন্য একজন পরিপূর্ণ আদর্শ।

ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)’র জন্ম

ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)’র জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্নমুখী বর্ণনা পাওয়া যায়। সুন্নী ঐতিহাসীকদের মতে তিনি নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

(১) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)’র ভালোবাসার কয়েকটি নিদর্শন : উম্মুল মু’মিনীন মা খাদিজাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)’র মৃত্যুর পর ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এ যোগ্যতা ও ফযীলাতের জন্য ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শিশুকাল থেকেই ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) অনেক বড় বড় ঘটনা দেখেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদের পক্ষ হতে যে সকল যুল্‌ম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাতে ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) তাঁকে যথাযতভাবে সহযোগিতা করেছেন ও সান্তনা দিতেন। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘোর বিরোধী ও দুশমন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরের সামনে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করত। ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) এগুলো নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন।

(২) আর একটি ঘটনা দেখুন **কত নিকৃষ্টভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্যাতন** করেছেন। হিজরতের পূর্বে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাবা গৃহের পাশে সালাত পড়ছিলেন। আবূ জাহল ও তার কিছু সাথী সেখানে বসেছিল। গতকাল উট যবাই হয়েছিল। আবূ জাহল বলল, অমুক গোত্রের উটনীর (গর্ভাশয়) ফুলটা নাড়ী-ভুড়ি নিয়ে এসে মুহাম্মদের ঘাড়ে কে রাখতে পারবে?

এ কথা শুনে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি উঠে গিয়ে ফুলটি নিয়ে এলো। অতঃপর যখনই নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদায় গেলেন তখনই সে সেটাকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। আর তা দেখে ওরা একে অন্যের গায়ে ঢলাঢলি করে হাসতে শুরু করল। সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে সেটাকে তাঁর ঘার থেকে সরিয়ে দেবে। ফলে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদাতেই থাকলেন। অতঃপর কোনো একজন তা দেখে নিজে কিছু করতে না পেরে নবী-কন্যা ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)-কে খবর দিলো। কিশোরী ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) আব্বার এমন বিপদের কথা শুনার সাথে সাথেই ছুটে এসে তা তাঁর ঘাঁড় হতে সরিয়ে ফেললেন। উল্লেখ্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রযিয়াল্লা-হু আন্হু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ দৃশ্য স্বয়ং নিজ চখে দেখেছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন আমার কিছুই করার ছিল না।[৮৩]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী একজন মা যেমন তার সন্তানের দেখাশুনা ও লালন পালন করে, ছোট বেলা থেকেই ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঠিক সেভাবেই দেখা-শুনা করতেন। যুদ্ধে তিনি আহত হলে ফাতিমা (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)-ই চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতেন অসুস্থ হলেই পাশে থাকতেন।

হিজরতের পর মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাতে ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা)-ও পিতার সাথে শরীক ছিলেন। বদর ও উহূদের যুদ্ধেও তিনি পিতার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। উহূদের যুদ্ধে স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহত হলেন এবং তাঁর শরীর রক্তাক্ত হলো। তাঁর নিচের শেয়ালের ডান দিকের পেষক দু’টি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে আহত আব্বাজানকে দেখে শরীরের সমস্ত রক্ত পানি ঢেলে ধুয়ে ফেললেন। ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু আন্হু) ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন। কিন্তু বার বার ধুয়ে পরিষ্কার করার পরেও যখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না তখন ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) এক খণ্ড পুরাতন চাটাই এনে পুড়াইয়ে এর ছাই ক্ষত স্থানে

** **সহকারী অধ্যাপক**, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও **খতীব**, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৯৪।*

সূচীপত্র

লাগিয়ে দিলেন এবং রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এ জন্যই মায়েরা তাদের সন্তানের নাড়ী কাটার পরে ঐ মাদুরের ছাই আজও ব্যবহার করে থাকে।[৮৪]

(৩) ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর যে পরিমান আদর এবং মায়া ছিল : রাসূল (ﷺ) ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)-কে সবচেয়ে বড় যে সুসংবাদটি দিয়েছিলেন সেটি সম্পর্কে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বলেন। রাসূল (ﷺ) এক দিন জমিনে চারটি দাগ টানলেন এবং বললেন– তোমরা কি জানো এটা কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) ভালো জানেন। রাসূল (ﷺ) বললেন, জান্নাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা হলেন– ১. খাদিজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ, ২. ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মদ, ৩. মারইয়াম বিনতু ‘ইমরান ও ৪. আসিয়া বিনতু মাযাহিম বা ফিরআউনের স্ত্রী।[৮৫]

রাসূল (ﷺ) কন্যা ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র প্রতি ভালোবাসার আর একটি **নিদর্শন :** উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমতাবস্থায় ফাতিমাহ্ হাটতে হাটতে আসলেন। আল্লাহর কসম! তার হাটার ধরণ ঠিক রাসূল (ﷺ)-এর মতোই ছিল। ফাতিমাহ্কে দেখেই স্বাগত জানালেন। অতঃপর তাকে তার ডান পাশে বসালেন। তার সাথে কানে কানে কিছু গোপন কথা বললেন। এতে তিনি প্রচুর কাঁদলেন। তাঁকে চিন্তিত ও কাঁদতে দেখে দ্বিতীয়বার আবার কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে তিনি এবার হাসতে লাগলেন– ‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) বলেন, আমি তাঁকে কাঁদা এবং হাঁসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর গোপন কথা ফাঁস করবো না। অতঃপর রাসূল (ﷺ) যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন ‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) কন্যার প্রতি অধিকার নিয়ে সেই কান্না ও হাঁসির কারণ জানতে চাইলেন। ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) এবার বললেন এখন আর বলতে কোনো অসুবিধা নেই। ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) বললেন, প্রথমে আমার সাথে যে গোপন কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে মা জিবরাঈল আমাকে প্রত্যেক বছর একবার কুরআন শুনিয়ে থাকেন এ বছর আমাকে দু’বার কুরআন শুনিয়েছেন। মা আমার ধারণা হয়ত আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। অতএব তুমি মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। তাই আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম। আর তিনি যখন আমাকে প্রচুর কাঁদতে দেখলেন তখন আমাকে পুনরায় বললেন, মা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে জান্নাতী মহিলাদের প্রধান। তখন এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।

(৪) ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর যেমন মুহাব্বত ছিল : কন্যার প্রতি পিতার ভালোবাসা সম্পর্কে মা ‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) বলেন, আকার-আচরণ ও কথা-বার্তায় রাসূল (ﷺ)-এর মতোই ছিল ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)। ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) তাঁর কাছে আসলে তিনি তার দিকে উঠে যেতেন স্বাগত জানালেন, তার হাত ধরতেন, চুমা দিতেন তাঁর বসার জায়গায় বসাতেন।[৮৬]

ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) আরো বলেছেন– ফাতিমাহ্ আমার দেহাংশ যে তাকে রাগান্বিত করে, কষ্ট দেয়, সে মূলত আমাকে কষ্ট দেয় এবং রাগান্বিত করে।[৮৭]

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ আছে– একদা ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) আবূ জাহেলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম দিলে ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) জেনে আব্বার কাছে এসে বললেন, আব্বা জান! আপনার গোষ্ঠির লোক ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) আবূ জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, অতঃপর বলি যে, আমি আবুল আস ইবনু রাবীকে (মেয়ে) বিবাহ দিয়েছি, সে আমাকে কথা দিয়ে সত্য প্রমাণ করেছে। আর ফাতিমাহ্ আমার দেহের টুকরা। আমি তাঁর খারাপ লাগাকে অপছন্দ করি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের বেটি ও মহান আল্লাহর দুশমনের বেটি একই ব্যক্তির কাছে একত্র হতে পারে না। সুতরাং এরপরে ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) ঐ পয়গাম প্রত্যাহার করে নেন।[৮৮]

(৫) ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র বিবাহ : হিজরতের এক বছর পর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কারোর প্রস্তাবেই সম্মতি দেননি। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন।

রাসূল (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই ‘আলী ইবনু আবূ তালিব (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলতেন না। এটি রাসূল (ﷺ) বুঝতে পেরে ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)-কে ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)’র সাথে বিয়ে দিতে চান। সে জন্য তিনি উভয়ের কাছে এ কথাটি উপস্থাপন করলে তাঁরা দু’জনই চুপ থাকেন। রাসূল (ﷺ) দু’জনের এ মৌনতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে বিয়ের আয়োজন করেন।

অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধের পর ‘আলী ইবনু আবূ তালিবের সাথে ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র বিয়ে সম্পন্ন

---

[৮৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭৪৩।*

[৮৫] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৬৮, সনদ সহীহ।*

[৮৬] *বুখারী- আল আদাবুল মুফরাদ, ৯৭১; আবূ দাঊদ- ৫২১৯।*

[৮৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭১৪, ৩৭৬৭।*

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭২৯।*

করেন। বিশ্বনবীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মোহরানা ছিল খুবই নগন্য।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছিল খুবই সাধারণ। রাসূল (ﷺ) ‘আলীকে ডেকে তাঁর ঢালটি বিক্রি করে বিয়ের অর্থ যোগাড় করার পরামর্শ দেন, ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঢালটি বিক্রি করে দুইশত দিরহাম পান যা দিয়ে তিনি ফাতিমার মোহরানা পরিশোধ করেন।

(৬) দাম্পত্য জীবন : নবী (ﷺ)-এর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অতী সাধারণ, সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম তিনি নিজ হাতেই করতেন। তিনি আটা তৈরির জন্য নিজ হাতেই যাঁতা ঘুরাতেন, এতে তাঁর হাতে দাগ পড়েছিল। পানির কলসী নিজেই বহন করতেন। নিজ হাতে ঘর-বাড়ি পরিষ্কারের কাজ করতেন ফলে তার পরিহিত কাপড় ময়লা যুক্ত থাকতো। এ সমস্ত কাজ-কর্মে সহযোগিতা করার জন্য পিতার কাছে একজন খাদেমের কথা বললে রাসূল (ﷺ) তাঁকে প্রত্যেক সালাতের পর কিছু তাসবীহ, তাকবীর ও প্রশংসার বাক্য শিখিয়ে দেন এবং বললেন মা খাদেমের সাহায্য নেওয়ার চেয়ে এগুলোই তোমার জন্য ভালো হবে।

(৭) ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র সন্তানাদি : ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হাসান ইবনু ‘আলী, হুসাইন ইবনু ‘আলী। মুহসীন ইবনু ‘আলী, যায়নাব বিনতু ‘আলী। হাসান ইবনু ‘আলী এবং হুসাইন ইবনু ‘আলীকে রাসূল (ﷺ) অত্যাধীক স্নেহ করতেন। তাদেরকে দুনিয়ার দু’টি ফুল বলেও আখ্যায়িত করেছেন। হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৪৯ হিজরিতে মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬১ হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে ১০ তারিখে কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে কুফাবাসীদের হাতে নিহত হন। মুহসীন ইবনু ‘আলী শিশুকালেই মৃত্যু বরণ করেন।

(৮) রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুতে কন্যার অবস্থা : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন নবী (ﷺ) বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন : হায়! আব্বাজানের কষ্ট। রাসূল (ﷺ) এ কথা শুনে বললেন, মা! আজকের দিনের পর তোমার আব্বার আর কোনো কষ্ট হবে না। অতঃপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহ্বান করলেন তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। অতঃপর যখন তাঁকে কবরস্ত করা হলো তখন ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সাহাবাদেরকে বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদের ভালো লাগল?[৮৯]

(৯) ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র মৃত্যু : রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর ছয় মাস পর ১১ হিজরিতে রমাযান মাসের তিন তারিখে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ অথবা ২৫ অথবা ২৯ বছর।

ইবনু আব্দিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র জন্যই সর্বপ্রথম মৃতদেহ বহনের খাট প্রস্তুত করা হয়। এর উপর লাশ রেখে উপরের দিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র অসিয়ত অনুযায়ী ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এভাবেই তাঁর খাটটি তৈরি করেছিলেন। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আসমা বিনতু উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন[৯০]। গোসল দেওয়ার সময় কেবল উক্ত দু’জনই ভিতরে ছিলেন। অন্য কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর জানাযার সালাতে কে ইমামতি করেছেন এ নিয়ে মতভেদ আছে, তবে ‘আলী নিজেই ইমামতি করেছেন, কেউ বলেছেন, আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার কেউ বলেছেন ফযল ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কেউ কেউ বলেছেন, ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র কবরে নেমেছিলেন। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র ওসীয়ত মোতাবেক রাতের আধারে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একাধীক কবর খনন করে যে কোনো একটিতে দাফন করে ফেলেন। সে জন্য আজও তাঁর কবরের স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র মৃত্যুতে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দারুনভাবে ব্যাথিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র মদীনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। রাসূল (ﷺ)-এর সর্বশেষ সন্তানের বিচ্ছেদে কাঁদতে কাঁদতে সাহাবীদের দাড়ী মোবারক ভিজে গিয়েছিল।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! ভাববার বিষয় বিশ্বনবী (ﷺ) তাঁর কলিজার টুকরা কন্যাকে খাদেম না দিয়ে নিজ হাতেই স্বামীর বাড়ির সকল কাজ-কর্ম করার আদেশ দিলেন এবং ‘ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি উৎসাহ দিলেন। যার জন্য আজ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম রমনীদের জন্য তাঁর এ প্রাণ প্রিয় কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র ‘ইবাদত-বন্দেগী, পালন করা, স্বামীর সেবা করা, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করা, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, বিপদে ধৈর্য ধারন করা, সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিজেই সম্পাদন করা এবং অন্যান্য বিষয়ে যে, উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন তা আজ সকলের সানন্দে গ্রহণ করা উচিৎ। পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের কাছে দু‘আ করি তিনি যেন আমাদের সকলকে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র রেখে যাওয়া আদর্শ গ্রহণের তাওফীক্ব দান করেন –আমীন। ❑

---

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৬২।*

[৯০] *মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ৪৭৬৯।*

সূচীপত্র

নিভৃত ভাবনা

ফুরালো তাক্বওয়ার মাস : কী পেলাম আমরা

–মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে আমরা পেয়েছিলাম তাক্বওয়ার মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, কুরআন নাযিলের মাস, রমাযান মাস। আমাদেরকে আচ্ছাদিত করল রহমত, বরকত ও মাগফিরাত দিয়ে। কিন্তু হায় দেখতে দেখতে চোখের পলকে যেন আমাদেরকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল! আমরা জীবন নামক বাগান থেকে হারিয়ে ফেললাম আরেকটি রমাযান। কী করলাম আমরা! একটু পিছন ফিরে দেখি তো? মুত্তাকী হতে পারলাম তো? নিজের পাপগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে পারলাম, তো নাকি পাপের খাতায় নাম এখনো রয়েই গেল?

রমাযান তো এসেছিল আমাদেরকে পরহেজগার মুত্তাকী বানানোর জন্যে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের উপর সিয়াম ফর্‌য করা হয়েছে, যেমন- তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফর্‌য করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"

কিন্তু **আমরা কি মুত্তাকী হতে পেরেছি?** নিজেদের পাপগুলোকে মহান রবের নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিতে পেরেছি? নাকি সারাদিন শুধু না খেয়েই থাকা হলো, কোনো নেকী অর্জন করতে পারলাম না, পাপের সাগরেই ডুবে রইলাম সারাক্ষণ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যাদের সিয়াম পালনে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না এবং অনেক ক্বিয়ামকারী বা তারাবী তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তি আছে যাদের কিয়াম-তারাবীহ থেকে শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কোনোই অর্জন হয় না।"[৯১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এরূপ সিয়ামপালনকারীর জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ্‌দু'আ করে বলেন, "যে ব্যক্তি রমাযান মাস পেল কিন্তু নিজের পাপগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারল না, তার জন্য দুর্ভোগ; সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে চির-বঞ্চিত বিতাড়িত। কখনো ভেবে দেখার সময় হয়েছে কি, কেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কি ছিল তাঁর অভিপ্রায়?

তিনি তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার 'ইবাদত করার জন্যে। সকল তাগূতকে বর্জন করে ইখলাসের সাথে কেবল তাঁরই দাসত্ব করার জন্যে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জিন্ ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।"[৯২]

কিন্তু আমরা কি রমাযানের সিয়ামগুলো একমাত্র তাঁর জন্য করতে পারলাম নাকি 'লোকে কি বলবে' এ ভয়ে সারাদিন না খেয়ে থাকলাম?

রমাযান তো এসেছিল আমাদেরকে জান্নাতী বানাতে। আদর্শ মুসলিম বানাতে। কিন্তু আমরা কি জান্নাতের 'আমল করতে পারলাম? সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি, গীবত, মিথ্যা কথা ছাড়তে পারলাম? যদি আমরা এগুলো বর্জন করতে না পারি তবে তো আমাদের সিয়াম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রাহ্য হবে না। এতো কষ্ট করে সারাদিন না খেয়ে থেকেও আমরা কোনো পারিতোষিক পাব না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করেনি, তাঁর এ পানাহার পরিত্যাগ করায় মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[৯৩]

রমাযান তো এসেছিল মানুষের প্রতি সহমর্মিতা শেখাতে। গরীব-দুস্থ মানুষেরা কতো কষ্টে দিন যাপন করে তা জানাতে, কিন্তু আমরা তাদের প্রতি সহমর্মিতা তো দূরে থাক; বরং সবকিছুর দাম বৃদ্ধি করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি আরো জুলুম করি। আসলে এটা তাক্বওয়ার পরিচয় নয়। আমরা যদি এরূপ কাজ করি তবে আমাদের সিয়াম আল্লাহ তা'আলার নিকট কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে একটু ভেবে দেখি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে রমাযান মাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে শিক্ষা অনুযায়ী সারা বছর চলার তাওফীক্ব দান করো। তুমি যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো আমাদেরকে তা করার তাওফীক্ব দান করো –আমীন। ❑

---

* *মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৯১] *সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[৯২] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৬।*

[৯৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৩।*

কবিতা

নাও চিনে নাও তারে

মোল্লা মাজেদ★

দু’চোখ ভরা স্বপ্ন আমার দূর নীলিমায় ভাসে
রিক্ত এ চোখ সিক্ত হয়ে ঘুরছে নিরুদ্দেশে।
পায় না খুঁজে পথের দিশা, চারদিক ঘোর অমানিশা
মিলবে কোথা তারই দিশা, কোন সে তেপান্তরে,
মিটবে কি অতৃপ্ত ক্ষুধা বাহিরে অন্তরে।

মানিক রতন অমূল্য ধন লুটায় অবিরাম
সাধন ছাড়া না যায় ধরা আজব ধরাধাম।
তত্ত্ব জ্ঞানে মত্ত যে জন, মিলায় সে ধন সেই মহাজন
সঠিক রাহে চলবে যে জন সে জন পেতে পারে
মিটায় ক্ষুধা সেই সে সুধা নাও চিনে নাও তারে।

সমাপ্ত

কাকে ভালোবাসো?

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

কারে তুমি আপন ভাবো
কাকে ভালোবাসো
খেল-তামাশায় কাটছে সময়
কেন এতো হাসো?
মরার পরে কাঁদবে দু’দিন
তারপরে আর কাঁদবে না
তোমার কথা যাবে ভুলে
মনে তো কেউ রাখবে না!
এই দুনিয়ার মিছে মায়ায়
কেন তুমি ভাসো?
কাকে ভালোবাসো!
যাঁর দয়াতে বেঁচে আছ
তাঁকেই আপন করো
তাঁর দেখানো পথে তুমি
জীবনটাকে গড়ো।
শয়তানের পথ ছেড়ে দিয়ে
রবের কাছে আসো।
মরার কথা ভুলে গিয়ে
কেন এতো হাসো?

সমাপ্ত

সরল পথ করো প্রদর্শন

মো. গিয়াস উদ্দিন★

প্রভু! তোমার নামে রাতে শয্যায় করি শয়ন,
ঘুম শেষ ঊষালগ্নে সালাত করি সমাপন
ঘুমের ভেতর যদি আমায় দাও মরণ,
ক্ষমা করো সকল গুনাহ, মন্দ আচরণ।
আর ঘুম শেষে যদি দাও ফিরিয়ে জীবন,
মু’মিন বান্দার মতো করো আদর যতন।

হে আল্লাহ! তুমি মহা মহিয়ান, শক্তিশালী,
পাঠ করি আমি তব কুরআনের বাক্যাবলি।
আমাকে রক্ষা করো শয়তানের হাত হতে,
নিক্ষেপ করো না কভু সৃষ্টির দ্বন্দ্ব সজ্জাতে
দূর করো মোর ঘাড়ে বসা দুষ্ট শয়তান,
ছিন্ন করো বন্ধন তারে বাঁচাও মোর প্রাণ।

প্রভু! সকল প্রশংসা তব করো খাদ্য দান,
দিয়েছ আশ্রয়, সুপেয় পানি করি পান।
তোমার ‘আযাব হতে রক্ষা করো দয়া করে,
যেদিন সঠিক হিসাব হবে রোজ হাশরে।

প্রভু! নেকির পাল্লা করো ভারি দাও সম্মান,
তোমার প্রিয় বান্দার সাথে দাও মোরে স্থান,
সহজ সরল পথ করো তুমি প্রদর্শন,
শান্তির ছায়াতলে করি এ জীবন যাপন।

সমাপ্ত

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

★ *৭০২, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।*

জমঈয়ত সংবাদ

ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড়ো মসজিদে ইফতার মাহফিল

গত ১২ রমাযান মোতাবেক ২৩ মার্চ শনিবার, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়ত ও বংশাল এলাকা জমঈয়তের সম্মিলিত উদ্যোগে আলোচনা সভা ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড়ো জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মহতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মাস্কো গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ সবুর। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা বিন বাহারুদ্দীন সালাফী।

কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতিবৃন্দ যথাক্রমে প্রফেসর ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, শাইখ মুফায্‌যল হুসাইন মাদানী ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সিনিয়র যুগ্ম- সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, অর্থ-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ এম জুলফিকার আলী, মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি ড. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাদানী, তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আবদুল হালীম মাদানী, দপ্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মমিনুল ইসলাম, সহকারী সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ আকমল হুসাইন, সহকারী ইয়াতীম ও নওমুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খ্যালন, সহকারী আইন ও সম্পত্তি বিষয়ক সেক্রেটারি আব্দুর রহমান বাবলু, নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ, যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ শামসুল হক শিবলী, ... আলহাজ্জ হাফেয সেলিম প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়ত ও বংশাল এলাকা জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচি

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক সদ্যগত রমাযানে দেশব্যাপী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি পালিত হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিবরণ পেশ করা হলো–

গত ৩ রমাযান বৃহস্পতিবার রাজশাহী জেলা পশ্চিমাঞ্চল জমঈয়তের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

৩ রমাযান বৃহস্পতিবার কুড়িগ্রাম জেলা জমঈয়ত সভাপতি এস এম রহমত উল্লাহ ইকবালের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তাবলীগ ও এরশাদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

৪ রমাযান শুক্রবার মেহেরপুর জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ।

৭ রমাযান সোমবার সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী।

৭ রমাযান সোমবার, খুলনা জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

১৭ রমাযান বৃহস্পতিবার পাবনা জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ রমাযান বুধবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল খানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ান শিক্ষক ও যাত্রাবাড়ি শাখা জমঈয়তের যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ আনীসুর রহমান মাদানী।

১৬ রমাযান বুধবার নওগাঁ জেলা জমঈয়ত সভাপতি আলহাজ্জ শামসুল হক-এর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি শাইখ মো. রবিউল ইসলাম।

১৭ রমাযান বৃহস্পতিবার রাজশাহী জেলা পূর্বাঞ্চল জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ইশতিয়াক বিন ইয়াহইয়া মাদানীর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন।

১৭ রমাযান বৃহস্পতিবার রংপুর জেলা জমঈয়ত সহ-সভাপতি মাহমুদার রহমানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রতিনিধি ও মাসিক আল ইখলাসের সম্পাদক শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

১৭ রমাযান বৃহস্পতিবার যশোর জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলীর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমদ।

১৯ রমাযান শনিবার ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ মনযুরে খোদার সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

১৯ রমাযান শনিবার রাজশাহী মহানগর জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক ড. বারকুল্লাহ'র সভাপতিত্বে মহানগর জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ রমাযান শনিবার বাগেরহাট জেলা জমঈয়ত সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে, জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ জালাল উদ্দীন মাদানী।

১৯ রমাযান শনিবার গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী ও শুব্বান প্রতিনিধি শাইখ নাযির আহমদ।

২০ রমাযান রবিবার দিনাজপুর জেলা জমঈয়তের দায়িত্বশীল মুহাম্মদ শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী ও প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম আব্দুল হালীম মাদানী প্রমুখ।

২১ রমাযান সোমবার নাটোর জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও মাসিক আল ইখলাসের সম্পাদক শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

২৩ রমাযান বুধবার কুষ্টিয়া জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. লোকমান হোসেন।

২৬ রমাযান শনিবার পঞ্চগড় জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ এনামুল হক প্রধানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী।

২৬ রমাযান শনিবার নীলফামারী জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের

ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমদ।

২৬ রমাযান শনিবার চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ আব্দুল খালেক রহমানীর সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। *[বি.দ্র. অবশিষ্ট জেলার প্রোগ্রামসূচি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল। গত ২৬ মার্চ মোতাবেক ১৫ রমাযান, মডেল টাউন উত্তরার জমজম কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। উত্তরা এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সেক্রেটারি আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান-এর পরিচালনায় বেলা সাড়ে ৩টায় প্রোগ্রাম শুরু হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চেয়ারম্যান ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উত্তরা এলাকা জমঈয়তের প্রধান উপদেষ্টা ও মাস্কো গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ সবুর। গেস্ট অব অনার ছিলেন পিএন এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি লি. এর চেয়ারম্যান নূর মুহাম্মদ তালুকদার ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবেক আইজিপি মুহাম্মদ রুহুল আমীন।

প্রধান অলোচক হিসেবে উপস্থিত কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, কেন্দ্রীয় জমঈতের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোতাহারুল ইসলাম, জমঈয়তের উচ্চবিদ্যাপীঠ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স টেকনোলজির রেজিস্ট্রার ও সাবেক সচিব মো. হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ডিআইজি মো. আব্দুল্লাহিল বাকী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি, আইটি বিশেষজ্ঞ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, বিশিষ্ট, ইসলামী স্কলার শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, কেন্দ্রীয় জমঈতের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, অর্থ-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ এম. জুলফিকার আলী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী ও সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহা. রেজাউল ইসলাম, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের আহ্বায়ক আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুল হক, শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস, বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার শাইখ ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ ও শাইখ ড. মুহাম্মদ রেজাউল করীম, খুলনা মাদরাসা আল মাহাদের অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

এ সমাবেশে উত্তরা ও উত্তরার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত প্রায় ছয় শতাধিক সায়েম অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উত্তরা এলাকা জমঈতের সহ-সভাপতি মো. মাশহুদুল বাসেত, সহকারী সেক্রেটারি মো. হাফিজুর রহমান আনসারী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মুহেব্বুল্লাহ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি ছাব্বির আহমাদ আরিফিন, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক মো. মহিউদ্দীন খোকন, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি ইঞ্জি. আলী আছগর ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

মৃত্যু সংবাদ

নওগাঁ জেলার ক্ষিদ্র কালিকাপুর শাখা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুসা কালিমুল্লাহ গত ৬ এপ্রিল শনিবার মৃত্যুবরণ করেছেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তিনি ক্ষিদ্র কালিকাপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসার সহকারি অধ্যাপক (আরবি বিভাগ) পদে চাকরিরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রীসহ এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি সকলের কাছে মাইয়্যিতের জন্য দু'আর আবেদন জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন ক্ষমা করেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। ❑

সূচীপত্র

স্বাস্থ্য সচেতনতা

প্রচণ্ড গরম : ডায়াবেটিস রোগীরা কী করবেন?

গরমের দিন সুস্থ মানুষই সহজে অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেখানে যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে তাদের আরও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। গরমে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। ঘাম বেশি হয়। ফলে শরীর কিন্তু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খুব বেশি গরম ডায়াবেটিসের রোগীরা মোটেই সহ্য করতে পারেন না।

দীর্ঘক্ষণ গরমের মধ্যে থাকলে তাদের শরীরেও কিন্তু একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও গরমে ডায়াবেটিসের রোগীদের রক্তশর্করার মাত্রাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। স্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলেই তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয় ডায়াবেটিসের রোগীদের। আর সেই মাত্রা যখন ৩৯ ডিগ্রি পেরিয়ে যায়, তখন কিন্তু গরম সহ্য করা মুখের কথা নয়। যে কারণে গরমের দিনে ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত সুগার পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

গরমে ডায়াবেটিস রোগীদেরই যেসব সমস্যা হয়

অকার্যকর ঘাম গ্রন্থি : নিয়মিতভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে রক্তনালি এবং স্নায়ুর ক্ষতি হয়। রক্তনালির উপর বেশি পরিমাণ চাপ পড়ে। শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গই ঘর্মগ্রন্থি আর সেই সঙ্গে উচ্চ রক্তশর্করার প্রভাবও কিন্তু পড়ে। আবার ঘাম বেশি হলে শরীর দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে। অকার্যকর ঘর্মগ্রন্থিগুলো তা মোটেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। যে কারণে ডায়াবেটিসের রোগীদের খুব বেশি গরমে বা অতিরিক্ত আর্দ্রতার মধ্যে থাকলে একাধিক সমস্যা হয়।

ঘন ঘন মূত্রত্যাগ : ডায়াবেটিসের রোগীদের আরও একটি সমস্যা হল ঘন ঘন মূত্রত্যাগ। কারণ রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে গেলে কিডনি তখন ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ছাঁকনির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তখন অতিরিক্ত গ্লুকোজ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীরের বাইরে বের হয়ে আসে। এর ফলে কিন্তু ডিহাইড্রেশনেরও সমস্যা হয়।

ইনসুলিন : শরীরের তাপমাত্রার সমতা বজায় না থাকলে কিন্তু ইনসুলিন মোটেও ঠিক করে কাজ করে না। সেখান থেকে আসে একাধিক সমস্যা। আর তাই এ ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। খুব গরম বা খুব বেশি আর্দ্রতায় কিন্তু এই সমস্যা স্বাভাবিক।

গ্রীষ্মকালে তাই যে সব নিয়ম অবশ্যই মেনে চলবেন : গরমকালে ঘাম বেশি হয়। আর তার কারণেই কিন্তু শরীর থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান বের হয়ে যায়। শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা যায়। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তাপ জনিত একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। আর তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের জটিল কোনও শারীরিক সমস্যা এড়াতে ঘন ঘন এবং বেশি পরিমাণে পানি খেতে হবে। আরামদায়ক পোশাক পরতে হবে এবং স্ট্রেসমুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

এ সময় অনেকেরই পেটের সমস্যা রয়েছে এমন মানুষরাও কিন্তু ভালোই সমস্যায় পড়েন। আর তাই চা ও কফি এড়িয়ে চলুন; বরং বাইরে বের হলে লেবুর পানি, ডাবের পানি পিপাসা মেটানোর জন্য এসব চলতে পারে। যারা নিয়মিত ওষুধ খান তারা অবশ্যই জেনে রাখবেন যে, কীভাবে ওষুধ সংরক্ষণ করতে হয়। সবসময় ওষুধ এমনভাবে রাখুন যাতে সূর্যের আলো কম আসে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বরফের মধ্যেও কিন্তু রাখবেন না। এতে ওষুধ নষ্ট হয়ে যায়। প্রয়োজন ছাড়া রোদে বের হবেন না।

গরমে ঘামের দুর্গন্ধ : করণীয়

প্রতিবারের মতো এবারও গ্রীষ্মের দাবদাহে মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা। এ সময় বিরক্তিকর ও বিব্রতকর সমস্যা হলো ঘামের দুর্গন্ধ। শুধু দুর্গন্ধ নয়, গরমে শরীরে ঘাম জমে ছত্রাকজাতীয় সংক্রমণ দেখা যায়। শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে বিশেষ করে কুঁচকি, আঙুলের ফাঁক ও যৌনাঙ্গে এই সংক্রমণ বেশি হয়। তাই সংক্রমণ এড়াতে শরীরের ভাঁজগুলোয় ঘাম জমতে দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ছত্রাকবিরোধী পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিদিন অন্তর্বাস ও মোজা পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া গরমে শরীরে ঘামাচি দেখা দিতে পারে। ঘামাচির চুলকানি রোধে অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি ঘামাচি থেকে পরিত্রাণ পেতে কখনো সিনথেটিক পোশাক পরা চলবে না। সব সময় সুতির ঢিলা পোশাক পরতে হবে।

খাবারে সালফারের পরিমাণ বেশি থাকলে শরীরের দুর্গন্ধ বাড়তে পারে। লাল মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, ব্রকলি, রসুন ইত্যাদি খাবারে সালফারের পরিমাণ বেশি থাকে। এমনকি বিভিন্ন খাবারে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। এসব খাবার খেলে নানা রকমের দুর্গন্ধ তৈরি হয়।

আবার যারা বেশি অ্যালকোহল পান করেন, তাদের শরীর থেকেও বাজে গন্ধ বের হতে পারে। অন্যদিকে মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন থাকলে দেহের অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। এতে শরীরের দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যায়।

বয়ঃসন্ধিতে অনেকের এই সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। যাদের ডায়াবেটিস, স্নায়ুর অসুখ অথবা হাইপারথাইরয়েডিজম আছে, তাদের সমস্যা বাড়তে পারে।

ঘামের এসব দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই বডি স্প্রে ব্যবহার করেন। তবে এতে রয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিক। তাহলে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার উপায় কী? ঘরোয়া উপায়েই ঘামের দুর্গন্ধ দূর করা যায় :

মধু : একটি পাত্রে সামান্য গরম পানি নিয়ে তাতে মধু মিশিয়ে রাখুন। গোসল শেষে মধুমিশ্রিত পানি গায়ে ঢেলে নিন।

বেকিং সোডা : বেকিং সোডা পেস্ট বানিয়ে বগলে লাগিয়ে নিন।

গোলাপজল : পানির সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে গোসল করুন। এটি দীর্ঘক্ষণ দেহকে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করে।

নিমপাতা : নিমপাতার ব্যবহারে ঘামের দুর্গন্ধ রোধ করা যায় সহজেই। ঘামের দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য শরীরে যে ব্যাকটেরিয়া দায়ী, তার বৃদ্ধি ঠেকাতে নিমপাতা খুব উপকারী। গোসলের সময় নিমপাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে ব্যবহার করলে শরীরের টক্সিন রোধ হয় এবং ঘামের কটু গন্ধ দূর হয়।

এছাড়া প্রচুর পানি পান করতে হবে। রোদে বের হতে হলে ছাতা, হ্যাট ব্যবহার করবেন। হালকা বা সাদা রঙের কাপড় পরবেন। ঘামে ভিজে গেলে পোশাক পাল্টে নিন। সুতি কাপড় পরবেন। তারপরও অতিরিক্ত ঘাম হলে বিব্রত না হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। *[সূত্র : প্রথম আলো]*

গরমে ঠান্ডা পানি পানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি

গরমে বাইরে থেকে ফিরেই সবার আগে ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি খোঁজেন? গরমের তীব্রতায় ঠাণ্ডা পানি পানের তৃষ্ণা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গরমে ঠাণ্ডা পানি পান করা কি আসলেই উপকারী, নাকি ক্ষতিকর? গরমে ঠাণ্ডা পানি পান করার মাধ্যমে শরীরের কিছু ক্ষতি ডেকে আনছেন আপনি নিজেই। কারণ ঠাণ্ডা পানি খেলে তা সাময়িক আরাম দিলেও তা হতে পারে দীর্ঘকালীন ক্ষতির কারণ।

পরিপাকতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়– বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা পানি পানের রয়েছে অনেকগুলো অসুবিধা। এই পানি পান করলে তা প্রভাবিত করতে পারে পরিপাকতন্ত্রকে। খেয়াল করে দেখবেন যে, আপনি যখন হালকা গরম পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন তখন আপনার ত্বকের ছিদ্র খুলে গিয়ে ত্বক আলগা হয়ে যায়। এদিকে ঠান্ডা পানিতে মুখ পরিষ্কার করলে মুখের ত্বক টানটান হয়ে যায়। তাই ঠাণ্ডা পানি পান করলে পরিপাকতন্ত্রে কী সমস্যা হয়, বুঝতেই পারছেন।

হৃদস্পন্দন কমিয়ে দেয়– বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠাণ্ডা পানি পান করলে তা হৃদস্পন্দন কমিয়ে দিতে পারে। তাইওয়ানের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঠাণ্ডা পানি পান করা হার্টের জন্য ক্ষতিকর। তাই বিপদ থেকে বাঁচতে ঠাণ্ডা পানি পানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। যাদের আগে থেকেই হার্টের সমস্যা রয়েছে, তারা ঠাণ্ডা পানি পুরোপুরি এড়িয়ে চলবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের ভয়– ভালো হজম কিংবা পেট পরিষ্কার না হলে শরীরে অসুখ বাসা বাধতে সময় নেয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে নানা সমস্যা শুরু হয়ে যায় আমাদের শরীরে। আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে ঠাণ্ডা পানি। কারণ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পান করলে যেকোনো খাবার হজম করা শরীরের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় বেড়ে যায় কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি।

মাথাব্যথা– মাথাব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ঠাণ্ডা পানি পানের অভ্যাস। বরফ মুখে দিলে দেখবেন খাওয়ার সময় কপালে চিনচিনে ব্যথা বোধ করছেন। একইভাবে ঠাণ্ডা পানি পান করলে তাও আপনার মাথাব্যথার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ঠাণ্ডা পানি আমাদের সংবেদনশীল স্নায়ুগুলোকে ঠাণ্ডা করে এবং দ্রুত মাথায় বার্তা পাঠায়। যে কারণে শুরু হয় মাথাব্যথা। *[সূত্র : ঢাকা পোস্ট]*

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে– তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। *ইবনু হিব্বান- মা: শা:, হা: ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা: শা:, হা: ১৬৬১।*

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমি সরকারের অংশীদারিত্বে পরিচালিত একটি সুদী ব্যাংকে চাকরি করি। দ্বীনী জ্ঞান অর্জিত হবার কারণে আমি এখন এই চাকরি ছেড়ে দেব বলে মনঃস্থির করেছি। চাকরি ছাড়ার পরে আমি উক্ত ব্যাংক থেকে পেনশন হিসেবে এককালীন কিছু টাকা পাব। আমার প্রশ্ন উক্ত টাকা ব্যবসায় বা কোনো ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ হালাল হবে কি না? দয়া করে উত্তর প্রদান করলে কৃতার্থ থাকব।***

সাজ্জাদ মাহমুদ
শ্রীমঙ্গল।

জবাব : ইসলামে সুদ হারাম– *(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫)*। যারা মনে করেন, সুদের মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায়, তারা প্রকৃত রক্তচোষা জাতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ﴾

“আল্লাহর কাছে সুদ কখনো বৃদ্ধি পায় না”– *(সূরাহ্ আর্ রূম : ৩৯)*। পক্ষান্তরে কর্যে হাসানাহ কিংবা যাকাত সমাজ থেকে দারিদ্রতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সুদী ব্যাংকে চাকরি করা বা কোনো প্রকার লেন-দেন করা, যার মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হয় তা সবই হারাম– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৯৭)*। আর যার মূলধন হারাম তার পুরো ব্যবসা হারাম। কাজেই সুদী টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে লাভ খাওয়া হারাম। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***এক মাযহাবী ভাই আমাকে এই প্রশ্নটা করেছেন যে, ঈমাম মাহদী যদি কোনো মাযহাব না অনুসরণ করেন তাহলে কি তিনি হাদীস অনুসরণ করবেন? আর যদি মাযহাব বা হাদীস অনুসরণ না করেন তাহলে তিনি শুধু কুরআন অনুসরণ করবেন কি-না বা তিনি মূলত কি অনুসরণ করে থাকবেন দলিলসহ জানতে চায়।***

রাশেদুজ্জামান রাজু
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : ইমাম মাহদী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এবং ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আগমন করে দাজ্জালকে পরাজিত করে কঠোর শাস্তি হত্যা কার্যকর করবেন। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ’র অনুসরণ করবেন– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২৫ ও ২৯৩৭)*। ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণে ইসলামী শাসন ক্বায়েম করবেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫)*। এতদ্সত্ত্বেও একদল বক্রচিন্তার অধিকারী মানুষ কাল্পনিক ও বানোয়াট কথার অবতারণা করে সমাজে ফিত্‌নার সৃষ্টি করে। এসব মূলতঃ হাদীস অস্বীকারকারী ভণ্ডদের কাজ। কাজেই এসব বিভ্রান্তিমূলক কথা এবং অপপ্রচার হতে সাবধান থাকতে হবে। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***কবর স্থানান্তর করা যাবে কি? যদি স্থানান্তর করা যায় তাহলে কি কবর থেকে লাশ তুলে আবার কবর দিতে জানাযা সালাত পড়তে হবে?***

মো. হোসনে মোবারক
গাবতলী, বগুড়া।

জবাব : মুসলিম নর-নারী জীবিত অবস্থায় যেভাবে সম্মানি, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরও সম্মানি। এজন্য কোনো মুসলিমের ক্ববর সাধারণতঃ খোঁড়া বা স্থানান্তর করা জায়িয নয়– *(আন্ নাওবী ‘আল-মাজমূ‘আ’- ৫/২৭৩)*। কোনো ক্ববর অন্যের জায়গায় দেওয়া হলে জমির মালিক যদি তুলে নিতে বাধ্য করে কিংবা সমাজ ও জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে ক্ববরটি স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে একান্ত বাধ্যগতভাবে তা জায়িয– *(মাজমূ‘আ ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ২৪/৩০৩)*। ক্ববর খুঁড়ে মৃত দেহের অবশিষ্ট যে অংশটুকু পাওয়া যাবে, তা সসম্মানে মুসলিম ক্ববরস্থানে বা নিরাপদ কোনো জায়গায় তা কেবল দাফন করে দিতে হবে; নতুন করে আর জানাযার সালাতের প্রয়োজন নেই। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***যতদূর দেখেছি মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার মেয়ে উম্মু কুলসুমকে দাফন করার সময় বলেছিল যে, তোমাদের মধ্যে কে গতদিন স্ত্রী সহবাস করোনি...? তখন আবূ ত্বালহাহ্ বলেছিল যে, মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি...! তখন মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন : তাহলে তুমি কবরে অবতরণ করো! তখন আবূ ত্বালহাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কবরে নেমেছিলেন এবং***

সূচীপত্র

উম্মু কুলসুমকে দাফন করেছিলেন। এখন আমাদের দেশে যে কেউ কবরে নামে, সে গতদিন সহবাস করলেও আর না করলেও...! কিন্তু আমার প্রশ্ন– গতদিন স্ত্রী সহবাস করেছে সেই ব্যক্তি কবরে অবতরণ করতে পারবে কি...? এবং সেই ব্যক্তি কবর খুড়তে পারবে কি...?

জাহিদ হাসান
মনিরামপুর, যশোর।

জবাব : আল্লাহভীরু মানুষ দ্বারা ক্ববর খোঁড়া ভালো। উম্মু কলসুম (রযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর কবর খোঁড়ার বিষয় নয়; বরং তাঁর দেহ ক্ববরে রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন : তোমাদের মধ্যে কে গতরাতে স্ত্রী সহবাস করোনি?– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১২৮৫)*। এ প্রশ্নের গতরাত্রে স্ত্রী সহবাসকারী ক্ববরে নামতে পারবে না এটা বুঝায়নি; বরং এখানে উদ্দেশ্য ছিল– এমন ব্যক্তি মহিলাদের লাশ দাফনের জন্য ক্ববরে নামবে, যে সদ্য স্ত্রী সঙ্গ হতে দূরে ছিল। যাতে ক্ববরে মহিলার লাশ রাখার সময় মহিলার দেহের কোনো অঙ্গ নিয়ে ঐ লোকের মনে কোনো প্রতিচ্ছবি পরিকল্পনায় না আসে– *(ফাতহুল বারী- ৩/১৫৯)*। কেননা, সদ্য স্ত্রী সঙ্গদানকারী পুরুষের মনে সহবাসের নিকটতম প্রতিচ্ছবি মহিলা দেখামাত্র কল্পনায় আসা স্বাভাবিক। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মেয়ে উম্মু কুলসুম (রযিয়াল্লা-হু আনহা)'র লাশ কবরে রাখার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুব যত্নসহকারে বিবেচনা করেছিলেন। কোনো লাশ রাখার জন্য যে কোনো মুসলিম ক্ববরে নামতে পারেন। তবে সমাজের অধিকতর দ্বীনদার ব্যক্তি দ্বারা এ কাজটি করালে মানুষ দ্বীন মুখী হবে এবং বেশি বেশি তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টায় সময় ও চিন্তা নিয়োজিত করতে উৎসাহবোধ করবে। তাই ক্ববরে নামার ব্যাপারে দ্বীনদার ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদের ক্বিবলার দিকে কবর আছে। উক্ত মসজিদে নামায হবে কি? আর মসজিদ বহাল থাকলে কবরটিকে কি স্থানান্তর করতে হবে?

মো. মনোয়ারুল কবীর (বাদশা)
কাঞ্চনপাড়া, নীলফামারী।

জবাব : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি কেবল মসজিদের জন্যই; তাতে কারো ক্ববর থাকতে পারে না। তাই যতদ্রুত সম্ভব মহল্লার সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে ক্ববরটি মসজিদের জায়গা হতে উঠিয়ে সসম্মানে কোনো মুসলিম ক্ববরস্থানে দাফন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ মৃতব্যক্তির জন্য আর কোনো জানাযার সালাত লাগবে না। এ কাজটি না করা পর্যন্ত মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও মহল্লাবাসী গুনাহগার হবেন। এক্ষণে আসি ঐ মসজিদে সালাত হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে : মসজিদের জায়গায় ক্বিবলামুখী ক্ববরটি যদি এ জন্য রাখা হয় যে, ঐ ক্ববরে শায়িত ব্যক্তির কারণে অত্র মসজিদে সালাত আদায় করলে বেশি নেকি হবে বা অকাট্যভাবে সালাত ক্ববুল হবে, তাহলে এটি মসজিদে সালাত হবে না। কেননা, এ শির্‌কের আড্ডা বটে। পক্ষান্তরে ভুলবশতঃ ক্ববর দেওয়া হয় এবং ক্ববর ও মসজিদের মাঝে প্রাচীর দিয়ে পৃথক করা হয়, তাহলে ঐ মসজিদে সালাত হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমি সরকারি এম. এম কলেজ, যশোরে গণিত বিভাগে অধ্যয়নরত আছি। যশোর শহরে আহলে হাদীস মসজিদ নেই বললেই চলে। অবশ্য একটা আছে। আমার থেকে বেশ দূরে। তবে আমার প্রশ্ন হলো– আমি যেখানে থাকি জায়গাটার নাম খড়কি, পীরবাড়ি এবং এখানে একটি মসজিদ আছে সেটা পীরবাড়ি মসজিদ। এই মসজিদের সাথে পীর জড়িত। মসজিদের সামনে পাকা করা পীরের মাজারও আছে যেখানে পূর্ববর্তী পীর যিনি মারা গিয়েছেন তার কবর। আবার এখানে ওরস শরীফও হয়। আমার প্রশ্নটি হলো– এই পীরবাড়ি মসজিদে কি নামায হবে? দয়া করে প্রশ্নের উত্তরটি সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রদান করবেন ইন্‌শা-আল্লাহ। জানা খুবই জরুরি। আমার মতো অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের পক্ষ থেকে আমি প্রশ্নটি করলাম।

নাঈম হাসান
সরকারি এম. এম কলেজ, সদর, যশোর।

জবাব : এ জিজ্ঞাসার জওয়াব ৫ নং প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। এ মসজিদ যেহেতু পীরের মসজিদ এবং সেখানে ওরশ হয়, তাই কোনো অবস্থাতে এ মসজিদে সালাত হবে না; বরং বাতিল হবে। জেনে-বুঝে কেউ এ মসজিদে সালাত আদায় করলে মুশরিকদের সমর্থনকারী বলে গণ্য হবে এবং একসময় ক্ববরপূঁজারি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। এ মসজিদ বাদ দিয়ে অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায় করুন! চাহে সেটি হানাফী মসজিদ হোক বা আহলে হাদীস মসজিদ হোক– তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : মায়ের দুধ দুই বছরের বেশি পান না করানো মর্মে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র উক্তির তাহ্‌ক্বীক্বসহ *(সুনানে দারাকুতনী- ৪/১৭৪)* *لا رضاع إلا في الحولين* ***–এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য বিস্তারিত জানতে চাই।***

মো. রোকনুজ্জামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : সন্তান গর্ভে ধারণের সর্বনিম্ন সীমা হলো ৬ মাস এবং দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ হচ্ছে ২ বছর। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

৬৫ বর্ষ ॥ ২৯-৩০ সংখ্যা ❖ ২২ এপ্রিল- ২০২৪ ঈ. ❖ ১২ শাওয়াল- ১৪৪৫ হি.

অত্র আয়াতে আল্লাহ গর্ভ ধারণ ও গর্ভপাতোত্তর দুধ পান করানোর মোট সময় উল্লেখ করেছেন ৩০ মাস তথা ২ বছর ৬ মাস। আর অপর আয়াতে তিনি দুধ পান করানোর সময় বলেছেন পূর্ণ ২ বছর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ দুধ পান করানোর মেয়াদ বলেছেন ২ বছর। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : “আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, পরিপূর্ণ দুধ পান করানোর মেয়াদ ২ বছর। আর এর অতিরিক্ত হচ্ছে সাধারণ খাদ্য তুল্য”– *(মাজমূ‘আ ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ৩৪/৬৩)*। কোনো মা যদি দেখেন যে, তার সন্তানকে ২ বছরের পর আরো কিছু দিন দুধ পান না করালে সন্তানের ক্ষতি হতে পারে, তাহলে আরো কিছু দিন দুধ পান করাতে পারেন– *(ফাতাওয়া আল লাযনাহ আদ্ দাইমাহ- ২১/৬০)*। আর একথাই সাহবী ইবনু মাস‘ঊদ ও ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে। আর প্রশ্নে উল্লেখিত (لا رضاع إلا في الحولين) এটি হলো আসার, যার বর্ণনা সনদ সহীহ– *(তাখরীয যাদুল মা‘আদ- ৫/৫২৫)*। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ফেরেশ্তারা নূর, জিন্ আগুন এবং মানুষের সৃষ্টি উপাদান মাটি। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি উপাদান কী?

আকরাম হোসেন
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

জবাব : আল্লাহ সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেন এবং এ পানিই সবকিছু সৃষ্টির মূল উপাদান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾

নূর, আগুন ও মাটি এসবের উপদানও ছিল পানি– *(সূরাহ্ আল আম্বিয়া- : ৩০)*। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিচিতি জানার জন্য যখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে উৎসমূলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন : আমি পানি হতে। এসব দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টির উপাদান হলো পানি। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : জিহাদ যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে সম্ভব এবং করণীয়গুলো কি কি? আর প্রকৃত জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

মুহাম্মাদ রাজীব বিন আব্দুল হামিদ
চুপড়িয়া, সাতক্ষীরা।

জবাব : আপনার প্রশ্নে প্রথম অংশ অস্পষ্ট। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্ভবতঃ এমন হতে পারে যে, সবচেয়ে বড় জিহাদ কোন্‌টি? অতঃপর জবাবে আমরা বলবো যে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) জিহাদকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। কিন্তু আমাদের কারো কারো মুখে একটি কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই সবচেয়ে বড় জিহাদ। আসলে কথাটি দলিলসম্মত নয়। তবে এটা সঠিক যে, নফসের সাথে জিহাদ ব্যতীত কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হবে না– *(বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মা‘আদ- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম)*।

জিজ্ঞাসা (১০) : আমার স্ত্রী রাগান্বিত হলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। গালমন্দ করে। আমাকেও ছাড়ে না। এমনকি স্বামীর পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোনসহ অন্যান্য আত্মীয়কেও গালাগালি করে। এমনকি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে কুত্তার বাচ্চা, শুকরের বাচ্চা এসবও বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয়।

আফজাল কবির
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেক্বি কাজ। বড় গুনাহ। রাগের সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা একটা মারাত্মক আত্মিক রোগ। অতিরিক্ত রাগও শরীয়তে নিন্দনীয়। হাদীসে রাগের সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়তে বলা হয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে ওযূ করে শান্ত হতে বলা হয়েছে। রাগের সময়ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না। এসব ভাষা খারাপ চরিত্র ও অভ্যাস থেকে আসে। পারিবারিক কালচারের কারণেও আসে। এমন আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। সংযম ও ধৈর্য শিখতে হবে। বিশেষ করে সম্মানিত ও বড়দের তো গালি দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে গালি দিতে পারে না। বুঝিয়ে বলতে পারেন। স্বামীর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়কে গালি দেওয়া কল্পনাও করা যায় না। স্ত্রীকে এসব বুঝেই চলতে হবে। তবে যদি স্বামীর এমন কোনো দোষ থাকে, যে জন্য স্ত্রী তার স্বামীকে পাগলের মতো হয়ে গালাগালি করে, তাহলে এর অন্য প্রতিকার আছে। অকথ্য ভাষায় গালাগালি নয়। আর মুরব্বীদের তো গালি দেওয়ার কোনো যুক্তি বা কারণই থাকতে পারে না। এখানে কি সমস্যা, তা বুঝতে হবে এবং স্টাডি করতে হবে। বড় আলেম বা পারদর্শী ব্যক্তিগণ এর সমাধান দিতে চেষ্টা করবেন। তবে, গালি দেওয়ার কোনো বৈধতা বা সুযোগ নেই। আশা করি আপনি অথবা আপনারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এমন একজন বয়স্ক-বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিবেন, যিনি পারবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ সমাধানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। ❑

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ রচনা

সুলতান হাসান আল বালখিয়া মসজিদ ফিলিপাইনের এক নান্দনিক স্থাপনা

–আবু ফাইয়ায

ফিলিপাইনের কোটাবাটো সিটির বরঙ্গে কালানগানানে অবস্থিত সুলতান হাজী হাসান আল বালখিয়া মসজিদ। কোটাবাটোর গ্র্যান্ড মসজিদ নামেও পরিচিত। এর স্থপতি ফেলিনো পালাফক্স। মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান আল বালখিয়া, দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে মসজিদটি নির্মাণ করেন। একসঙ্গে ৬০ হাজার মুসল্লি এ মসজিদে সালাত আদায় করতে পারেন।

সাত হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইন। এই দ্বীপগুলোর মাত্র ১১টি বসবাসের উপযোগী। তিন শতাব্দী ধরে স্পেনের উপনিবেশ ছিল ফিলিপাইন। দেশটির নামও স্প্যানিশ রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে রাখা হয়েছে। রাজধানীর নাম ম্যানিলা। দেশটির আয়তন ২ লাখ ৯৯ হাজার ৭৬৪ বর্গকিলোমিটার। ফিলিপাইনের জনসংখ্যা ১০ কোটির ওপরে (২০১৫ সালের হিসাব)। ফিলিপাইনের দ্য ন্যাশনাল মুসলিম অব কমিশনের হিসাব মতে, মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৪ শতাংশ। এশিয়ার যে দু'টি দেশে ক্যাথলিকেরা সংখ্যাগুরু ফিলিপাইন তার অন্যতম।

ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্মের ইতিহাস বেশ প্রাচীন; ইসলাম ফিলিপাইনের সবচেয়ে প্রাচীন নথিভুক্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম। পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ ভারত এবং অন্যান্য মুসলিম সালতানাত থেকে আগত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ১৪শ শতকে ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। সর্বপ্রথম মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের আগমন ঘটে।

১৩৮০ সালে করিম উল মাখদুম নামক এক আরব বণিক সর্বপ্রথম ফিলিপাইনের সুলু ও জুলু দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন এবং সেখানে তিনি বাণিজ্যের সাথে সাথে সমস্ত দ্বীপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। এভাবেই ফিলিপাইনে প্রথম ইসলাম প্রতষ্ঠিত হয়। ১৩৯০ সালে মিনাঙ্গকাবাউ রাজবংশের প্রিন্স রাজা ব্যাগুইনদা এবং তার অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। শেখ করিম আল-মাখদুম মসজিদটি ফিলিপাইনের প্রথম মসজিদ যা মিন্দানাওয়ের সিমুনুল প্রদেশে অবস্থিত। শেখ মখদুম করিম নামে এক আরব ব্যবসায়ী ১৩৮০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমণকারী আরব ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে ফিলিপাইনে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়। চীন, ভারত এবং পারস্য থেকে আগত মুসলিম মিশনারিদের দ্বারাও এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়। তৎকালীন ফিলিপাইনের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রদেশসমূহ– মাগুইন্দানাও সালতানাত, সুলু সালতানাত, লানাও সালতানাত এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনের অন্যান্য অংশ।

ফিলিপাইনে আড়াই হাজারের মতো মসজিদ রয়েছে। প্রায় সবগুলো মসজিদে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা, অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ, লাশ গোসল করানো, কনফারেন্স কক্ষ ও হেফজ মাদরাসার সমন্বয়ে একটি করে ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। ফিলিপাইনের মসজিদগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের গর্বের বিষয়। মসজিদ ছাড়াও প্রায় ১২০টির মতো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ও অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ সুলতান হাজি হাসান আল বলখিয়া মসজিদ। এটি বলখিয়া মসজিদ কিংবা কোটাবাটো গ্র্যান্ড মসজিদ নামেও পরিচিত। মসজিদটি যেন সাজানো প্রাসাদ। ফিলিপাইনে নতুন গড়ে ওঠা কোটাবাটো শহরে মসজিদটি অবস্থিত। ফিলিপাইনের মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান আল বলখিয়া ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ে মসজিদটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

কারুকাজ আর স্থাপত্যশৈলী এ মসজিদের বৈশিষ্ট্য নয়। এসবের পরিবর্তে সাধারণত্বের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এ মসজিদের সৌন্দর্য আর প্রবল আকর্ষণের কারণ। দামি জিনিসপত্র ব্যবহার, কারুকাজ আর জটিল নির্মাণশৈলী ছাড়াও যেকোনো স্থাপনা আকর্ষণীয় ও নয়নাভিরাম হতে পারে তার সাক্ষ্য বহন করছে ফিলিপাইনের এ মসজিদ। মসজিদের সাধারণ নির্মাণশৈলী আর চারপাশের মনোরম পরিবেশ একে দান করেছে অপরূপ সৌন্দর্য আর মাধুর্য। মসজিদের তিন দিকে নয়নাভিরাম জলাধার, এক দিকে পাহাড়-শ্রেণি, বৃক্ষরাজি ঘেরা বিশাল উদ্যান এবং অদূরে বিশাল সাগরের নীল জলরাশি– সব কিছু এ মসজিদের পুরো পরিবেশকে করে তুলেছে নৈসর্গিক। কখনো কখনো মনে হয় যেন মসজিদ নয় বরং সাজানো এক অপরূপ রাজপ্রাসাদ এটি। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রাচীন আর আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে নির্মিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। ২০১১ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। একসঙ্গে ৬০ হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারেন এ মসজিদে। ৪৩ মিটার বা ১৪১ ফুট উচ্চতার চারটি মিনার, ১৪টি গম্বুজ রয়েছে এ মসজিদে। গম্বুজের সোনালি রং মন কাড়ে দর্শকদের। সুলতান বলখিয়া মসজিদ আর এর চারপাশের মনোরম পরিবেশের কারণে এ এলাকা এখন কোটাবাটো নগরবাসীর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। শুধু মুসলিম নয় অমুসলিম পর্যটকরাও এ মসজিদ দেখতে ভিড় করেন। *[সূত্র : উইকিপিডিয়া, নয়াদিগন্ত অনলাইন, চ্যানেল আই অনলাইন ও অন্যান্য]*

সূচীপত্র

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ’র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (মে)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪ : ০৪	০৫ : ২৪	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৮
০২	০৪ : ০৩	০৫ : ২৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৯
০৩	০৪ : ০২	০৫ : ২২	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৮	০৭ : ৫০
০৪	০৪ : ০১	০৫ : ২২	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৯	০৭ : ৫০
০৫	০৪ : ০০	০৫ : ২১	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ২৯	০৭ : ৫১
০৬	০৩ : ৫৯	০৫ : ২১	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩০	০৭ : ৫২
০৭	০৩ : ৫৮	০৫ : ২০	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩০	০৭ : ৫২
০৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ১৯	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫৩
০৯	০৩ : ৫৭	০৫ : ১৯	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩১	০৭ : ৫৪
১০	০৩ : ৫৬	০৫ : ১৮	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩২	০৭ : ৫৪
১১	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৮	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩২	০৭ : ৫৫
১২	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৭	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৬
১৩	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৭	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৬
১৪	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৬	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৭
১৫	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৬	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৮
১৬	০৩ : ৫২	০৫ : ১৫	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৮
১৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৫	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৯
১৮	০৩ : ৫১	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৫	০৮ : ০০
১৯	০৩ : ৫০	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৬	০৮ : ০০
২০	০৩ : ৫০	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৬	০৮ : ০১
২১	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৩	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৭	০৮ : ০২
২২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৩	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৭	০৮ : ০২
২৩	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৩	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৮	০৮ : ০৩
২৪	০৩ : ৪৮	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৮	০৮ : ০৪
২৫	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৯	০৮ : ০৪
২৬	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৯	০৮ : ০৫
২৭	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪০	০৮ : ০৫
২৮	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪০	০৮ : ০৬
২৯	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪১	০৮ : ০৭
৩০	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪১	০৮ : ০৭
৩১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৮

সূচীপত্র

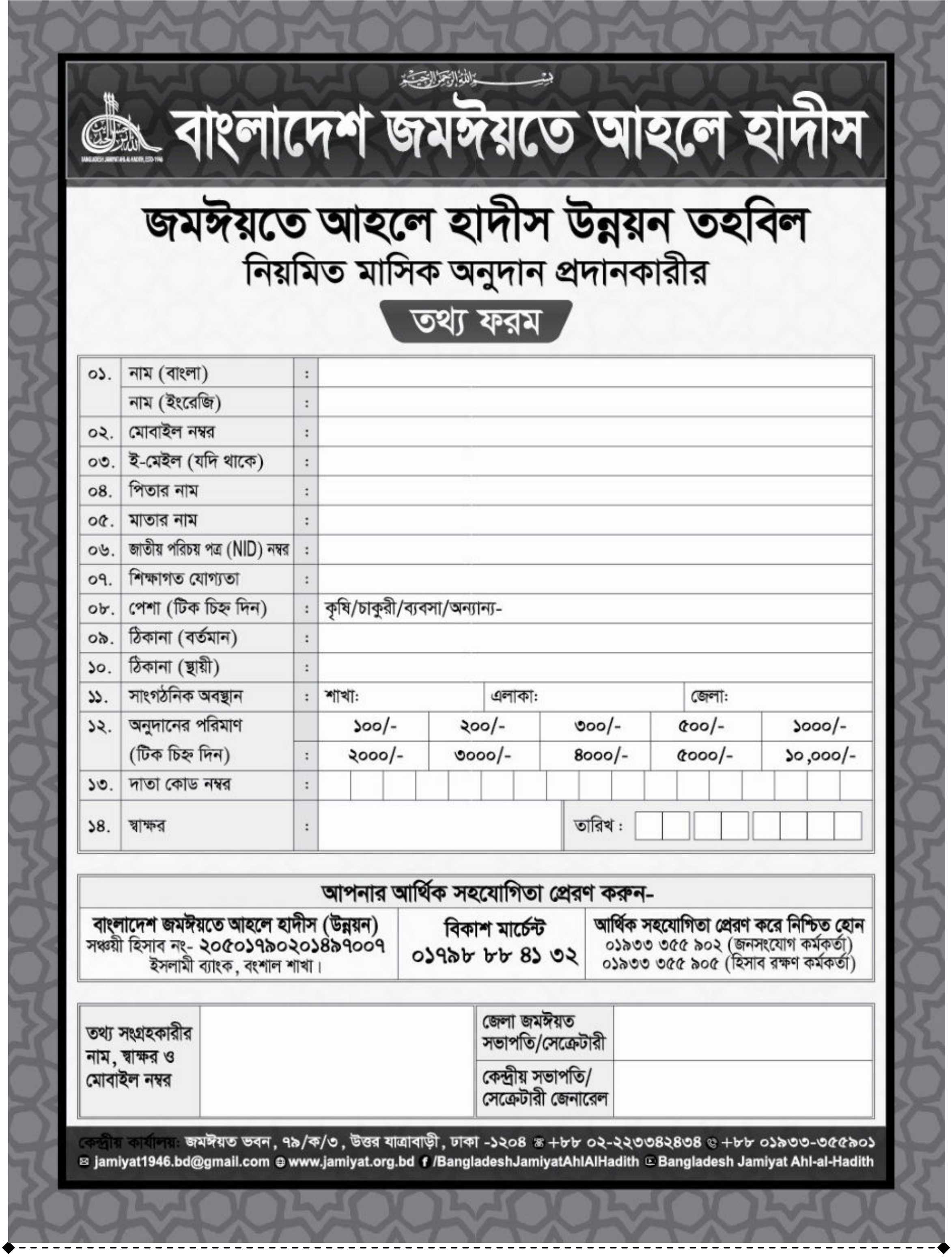

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জমঈয়তে আহলে হাদীস উন্নয়ন তহবিল

নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদানকারীর

তথ্য ফরম

০১.	নাম (বাংলা)	:					
	নাম (ইংরেজি)	:					
০২.	মোবাইল নম্বর	:					
০৩.	ই-মেইল (যদি থাকে)	:					
০৪.	পিতার নাম	:					
০৫.	মাতার নাম	:					
০৬.	জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নম্বর	:					
০৭.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:					
০৮.	পেশা (টিক চিহ্ন দিন)	:	কৃষি/চাকুরী/ব্যবসা/অন্যান্য-				
০৯.	ঠিকানা (বর্তমান)	:					
১০.	ঠিকানা (স্থায়ী)	:					
১১.	সাংগঠনিক অবস্থান	:	শাখা:		এলাকা:		জেলা:
১২.	অনুদানের পরিমাণ		১০০/-	২০০/-	৩০০/-	৫০০/-	১০০০/-
	(টিক চিহ্ন দিন)	:	২০০০/-	৩০০০/-	৪০০০/-	৫০০০/-	১০,০০০/-
১৩.	দাতা কোড নম্বর	:					
১৪.	স্বাক্ষর	:			তারিখ :		

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (উন্নয়ন) সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১৭৯০২০১৪৯৭০০৭ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	**বিকাশ মার্চেন্ট** ০১৭৯৮ ৮৮ ৪১ ৩২	**আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন** ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২ (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর		জেলা জমঈয়ত সভাপতি/সেক্রেটারী	
		কেন্দ্রীয় সভাপতি/ সেক্রেটারী জেনারেল	

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ✆ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
✉ jamiyat1946.bd@gmail.com ⊕ www.jamiyat.org.bd f /BangladeshJamiyatAhlAlHadith ▶ Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

সূচীপত্র

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক
র‍্যাংকিংভুক্ত **কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির** সাবেক সনামধন্য
শিক্ষক **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম** কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা
পৃথক শাখা

আমাদের
নিয়মিত
অ্যাকাডেমিক
প্রোগ্রাম

- **তাহফীজুল কুরআন**
  মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
- **ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
  হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
  (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
- **উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম**
  আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
  ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
  কুরআন শিক্ষা
  দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk.**25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মেধাবৃত্তির সুবিধা

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

নিজস্ব খেলার মাঠ

✆ 01329-728375-78 🌐 www.iiustb.ac.bd ✉ info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং**
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত